ঘরজামাই

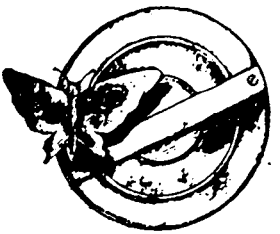

১

বাঁকা নদীতে তখন জল হত খুব। কুসুমপুরের ঘাটে নৌকো ভিড়ত। জষ্টিমাসে শ্বশুরবাড়িতে আসছিল বিষ্ণুপদ। কী ঠাঁটবাট। কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, তাতে সোনার বোতাম, পায়ে নিউকাট, ঘাড়ে পাকানো উড়ুনি। চোমড়ানো মোচ আর কোঁকড়া চুলের বাহার তো ছিলই। আরও ছিল, কটা রং আর পেল্লায় জোয়ান শরীর। নৌকো ঘাটে লাগল। তা কুসুমপুরের ঘাটকে ঘাট না বলে আঘাটা বলাই ভাল। খেয়া নৌকো ভিড়তে না ভিড়তেই যাত্রীরা ঝাপাঝপ জলে কাদায় নেমে পড়ে। বিষ্ণুপদ সেভাবে নামে কী করে। উঁচু পাড়ের ওপর স্বয়ং শ্বশুরমশাই ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে, পাশে তিন সম্বন্ধী, নতুন জামাইকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। বিষ্ণুপদ টলোমলো নৌকোয় বাঁ হাতে সাত সেরী একখানা রুই মাছ আর ডান হাতে ভারী স্যুটকেস নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে হেল-দোল করছে। তবে হ্যাঁ, বিষ্ণুপদ পুরুষমানুষই ছিল বটে। দেমাকও ছিল তেমনি। নৌকো থেকে জামাই নামছে, নৌকোর মাঝিই এগিয়ে এল ধরে নামাবে বলে। বিষ্ণুপদ বলল, কভি নেহি। আমি নিজেই নামব।

তা নামলও বিষ্ণুপদ। সাতসেরী মাছ আর স্যুটকেস সমেত বাঁ পা-টা কাদায় গেঁথে গিয়েছিল মাত্র, আর কিছু হয়নি। মাছ বা স্যুটকেসও হাত ছাড়া হয়নি, সেও কাদায় পড়ে কুমড়ো গড়াগড়ি যায়নি। তিন শালা দৌড়ে এসে কাদা থেকে বাঁ পা-খানা টেনে তুলল। জুতোখানা অবশ্য একটু খুঁজে বের করতে হয়েছিল।

সেই আসাটা খুব মনে আছে বিষ্ণুপদর, কারণ সেই আসাই আসা। একেবারে চূড়ান্ত আসা। শ্বশুরমশাই মাথায় ছাতা ধরলেন, দুই চাকর মাছ আর বাক্স ভাগাভাগি করে নিল। পাড়ার দু'চারজন মাতব্বরও জুটে গিয়েছিল সঙ্গে।

শ্বশুরমশাই কাকে যেন হাসি হাসি মুখে অহংকারের সঙ্গে বললেন, কেমন জামাই দেখছ?

আহা, যেন কার্তিক ঠাকুরটি। তোমার বরাত বেশ ভালই হরপ্রসন্ন।

গৌরবে বুকখানা যেন ঠেলে উঠল বিষ্ণুপদর।

বাড়িতে ঢুকতেই মেয়ে মহলে হুড়োহুড়ি, উলু, শাঁখ। সে এক এলাহি কাণ্ড। সদ্য পাঁঠা কাটা হয়েছে মস্ত উঠোনের একধারে। বাঁশে উল্টো করে ঝুলিয়ে তার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। আর এক ধারে অন্তত বিশ সেরী পাকা একখানা কাতলা মাছ বিশাল আঁশ বঁটিতে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কাটছে দু'জন মুনীশ। সারা বাড়িতে একটা উৎসবের কলরব। শুধুমাত্র একটি জামাইয়ের জন্য। পাড়ার বাচ্চারা সব ঝেঁটিয়ে এসেছে। বউরা সব দৌড়ে আসছে কাজকর্ম ফেলে।

কাছারিঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়েছিল তাকে। নিচু একখানা চৌকির ওপর গদি, তাতে ধপধপে চাদর, তাকিয়া। গোলাপজল ছিটোনো হল গায়ে। দু'জন চাকর এসে বাতাস করতে লাগল। গাঁয়ের সজ্জন, মুরুব্বি সব দেখা করতে এল। সকলের চোখই সপ্রশংসিত।

সে একটা দিন গেছে। বর্ষার জল নামলে নদী আর সে জল বইতে পারে না, পাড় ভাসিয়ে দেয়। খেয়া বন্ধ হয়েছে অনেক দিন। কংক্রিটের ব্রিজ হয়ে অবধি এখন ভারী ভারী বাসের যাতায়াত। কুসুমপুর ঘেঁষেই পাকা সড়ক, তা ধরে নাকি হিল্লি-দিল্লি যাওয়া যায়।

ওই পাকা সড়ক থেকেই রিকশা করে পঁক পঁক করতে করতে বিষ্ণুপদর জামাই গোবিন্দ এল। একে কি আসা বলে। খবর নেই, বার্তা নেই, পাতলুনের ওপর হাওয়াই শার্ট চাপিয়ে চটি ফটফটিয়ে এসে দাঁত কেলিয়ে হাজির হলেই হল।

নতুন জামাই কত ভারভাত্তিক হবে, তা নয়। এ যেন এক ফচকে ছোঁড়া ফস্টিনস্টি করতে এসেছে। তা হচ্ছেও ফস্টিনস্টি। দাওয়ায় মামাতো শালিরা সব ঘিরে ধরেছে, হাহা হি হি হচ্ছে খুব। চারদিকে

গুরুজন, তোয়াক্কাই নেই। কিন্তু দুঃখ অন্য জায়গায়। জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ে মুক্তির ভাব হচ্ছে না, কিছু একটায় আটকাচ্ছে। মেয়েকে বিয়ের পর থেকেই ফেলে রেখেছে বাপের বাড়িতে। খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

কাঁঠাল গাছের ছায়ায় সাতকড়ি পুরনো কাঠ জুড়ে একখানা চৌকি বানাচ্ছে। গুষ্টি বাড়ছে, জিনিসও লাগছে। গাছের ছায়ায় একখানা মোড়া পেতে বসল বিষ্ণুপদ।

সাতকড়ির দাঁতে ধরা একখানা বিড়ি। তাতে অবশ্য আগুন নেই। বিড়িখানা দাঁতে ধরে রেখেই সাতকড়ি বলে, মেয়েখানা দিব্যি পার করেছ জামাইদা। এখন আমার কপালে কী আছে তাই ভাবছি। তিন তিনটে মেয়ে বিয়োলো বউ। সবই কপাল।

সাতকড়ির দুঃখটা বেশ করে অনুধাবন করে নেয় বিষ্ণুপদ। দোষটা যে কার, তা এই বয়সেও সে ঠিক বুঝতে পারে বলে মনে হয় না। কিছু কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে তা শেষ অবধি বুঝ-সমঝের মধ্যেই আসে না। কপাল বললে ল্যাটা চুকে যায় বটে, কিন্তু তাতে মনটা কেমন সায় দেয় না।

সাতকড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কেমন কার্তিকের মতো জামাই।

বিষ্ণুপদর একটু আঁতে লাগে। সবাই কার্তিক হলে তো কার্তিকের গাদি লেগে যাবে। সে তাচ্ছিল্যভরে বলে, হুঁ, কার্তিক! না কেলে কার্তিক!

সাতকড়ি র‍্যাঁদা চালাতে চালাতে বলে, রং ধুয়ে কি জল খাবে জামাইদা? নাটাগড়ে তোমার জামাইয়ের মোটর গ্যারাজখানা দেখেছ? দিনরাত আট দশজন লোক খাটছে। বাপ আর চার ভাই মিলে মাস গেলে অন্তত পাঁচ ছ হাজার টাকা কামাচ্ছে। তার ওপর চাষ-বাস, মুদিখানা। এ যদি কার্তিক না হয় তা হলে কার্তিক আর কাকে বলে শুনি!

তা বলে অমন পাতলুন-পরা ফচকে জামাই আমার পছন্দ নয় বাপু। চেহারা দেখ, পোশাক দেখ, হাবভাব দেখ, জামাই বলে মনে হয়? একটু ভারভাত্তিক, গুরুগম্ভীর না হলে মানায়! আমরাও তো জামাই ছিলুম, না কি? সহবত কি কম দেখেছিস?

সাতকড়ি পুরনো লোক। হাতের কাজ থামিয়ে সে বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে বলে, পুরনো কথা তুললেই ফ্যাসাদ, বুঝলে জামাইদা? ওসব নিয়ে ভেবো না। মেয়ে খেয়ে-পরে সুখে থাকলেই হল।

বিষ্ণুপদ একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। তার জামাই গোবিন্দ একটু তেরিয়া গোছের লোক। নিতান্ত দায়ে না পড়লে পেন্নাম টেন্নাম করে না, বিশেষ পাত্তাও দেয় না শ্বশুরকে। কানাঘুঁষো শুনেছে, শ্বশুর ঘরজামাই ছিল বলে গোবিন্দ একটু নাক সিঁটকোয়। বিপদ হল নাটাগড় থেকে তার নিজের বাড়ি গ্যাঁড়াপোতা বিশেষ দূরে নয়, পাঁচ ছ মাইলের মধ্যে। আর গ্যাঁড়াপোতায় গোবিন্দর এক দিদির বিয়ে হয়েছে। যাতায়াতও আছে। জামাই একদিন ফস করে বলেও বসল, আপনার মা ঠাকরোন যে এখনও বেঁচে আছেন সে কথা জানেন তো!

বড্ডই স্পষ্ট খোঁচা। কথাটা ঠিক যে, নিজের বাড়ির পাট একরকম চুকিয়েই দিয়েছিল বিষ্ণুপদ, বাপ আর ভাইদের সঙ্গে সদ্ভাবও ছিল না। বিয়ের পর এ যাবৎ দু'চার বার গেছে বটে, কিন্তু সে না যাওয়ারই সামিল। গত দশ বারো বছরের মধ্যে আর ওমুখো হয়নি। কিন্তু তাতে দোষের কী হল সেইটেই বুঝে উঠতে পারে না বিষ্ণুপদ। সেই কারণেই কি জামাই তাকে অপছন্দ করে?

সাতকড়ি বিড়িটা খেয়ে বলে, আগে কত শেয়াল ডাকত সাঁঝবেলা থেকে, এখন একটারও ডাক শোনো?

বিষ্ণুপদ একটু অবাক হয়ে বলে, শেয়াল! হঠাৎ শেয়ালের কথা ওঠে কেন রে?

বলছিলুম, পুরনো দিনের কথা তুলে লাভ নেই। শেয়াল নেই, কুসুমপুরের ঘাট নেই, বাঁকা নদী মজে এল, পাকা পুল হল, শেতলা পুজোয় মাইক বাজা শুরু হল, ফি শনিবার বাজারে ভি ডি ও বসছে। এত সব হল, আর জামাই পাতলুন পরলেই কি কল্কি অবতার নেমে এল নাকি?

কিন্তু পুরনো দিনের কথা বিষ্ণুপদই বা ভোলে কী করে? গ্যাঁড়াপোতায় নিজের বাড়িতে তার কদর ছিল না। তিনটে ভাই আর তিনটে বোন নিয়ে সংসার। বাবার অবস্থা বেহাল ছিলই। তার ওপর বিষ্ণুপদ ছিল একটু পালোয়ান গোছের। ডন-বৈঠক, মুগুর ভাঁজা, ফুটবল, সাঁতার এইসব দিকে মন। অনেক সময় হয়, এক মায়ের পেটে জন্মেও সকলে সমান আদর পায় না। বিষ্ণুপদ ছিল হেলাফেলার ছেলে।

স্পষ্টই বুঝত এ বাড়িতে তার কদর নেই। কদর জিনিসটা সবাই চায়, নিতান্ত ন্যালাক্ষ্যাপারও কদরের লোভ থাকে। দু' বেলা দুটো ভাত আর মেলা গঞ্জনা জুটত। কাজ-টাজের চেষ্টা নেই, দুটো পয়সা ঘরে আনার মুরোদ নেই, বোনগুলো ধুমসো হয়ে উঠছে—সেদিকে তার খেয়াল নেই। নানা গঞ্জনায় জীবনটা ভারী তেতো হয়ে যাচ্ছিল। গ্যাঁড়াপোতার বটতলাই ছিল তখন সারা দিনমানের ঠেক। গাঁয়ের আরও কয়েকটা ছেলে এসে জুটত। পতিতোদ্ধারের জন্য মহাকালী ক্লাব খুলেছিল তারা। মড়া পোড়ানো থেকে বন্যাত্রাণ, কাঙালি ভোজন বারোয়ারি পুজো, মারপিট, যাত্রা থিয়েটার কথকতা সবই ছিল তাদের মহা মহা কাজ। বাইরে বাইরে বেশ কাটত। ঘরে এলেই মেঘলা, গুমোট, মুখভার, কথার খোঁচা, বাপান্ত। সেই সময় গ্যাঁড়াপোতার পাশেই কালীতলা গাঁয়ে এক শ্রাদ্ধবাসরেই তাকে দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেল ভাবী শ্বশুর হরপ্রসন্নর। টাকাওলা লোক। পাঁচ গাঁয়ের লোক এক ডাকে চেনে। চারটে ছেলের পর একটা মেয়ে। বাপের খুব আদরের। হরপ্রসন্ন তখন ঘরজামাই খুঁজছেন। শ্রাদ্ধবাড়িতেই ডেকে কাছে বসিয়ে মিষ্টি মিষ্টি করে সব হাঁড়ির খবর নিলেন। গরিব ঘরের ছেলেই খুঁজছিলেন, নইলে ঘরজামাই হতে রাজি হবে কেন? বিয়ের গন্ধে বিষ্ণুপদও চনমন করে উঠল। এতকাল ও কথাটা ভাববার সাহসটুকু অবধি হয়নি। বিয়ে যে তার কোনওকালে হবে এমনটি সে কারও মুখে শোনেওনি কোনও কালে। যেই কথাটা উঠল অমনি বিষ্ণুপদর ভেতরে তুফান বয়ে যেতে লাগল। পারলে আগাম এসে শ্বশুরবাড়িতে হামলে পড়ে। সেই বিয়ে নিয়েও কেচ্ছা কম হয়নি। প্রথমেই বাপ বেঁকে বসল। মাও নানা কথা কইতে শুরু করল। ঘরজামাই যখন নিতে চাইছে তখন মেয়ে নিশ্চয়ই খুঁতো। তা ছাড়া এ-বংশের কেউ কখনও ঘরজামাই থাকেনি, ওটা বড় লজ্জার ব্যাপার।

বিষ্ণুপদ দেখল তার সুমুখে ঘোর বিপদ। বিয়ে বুঝি কেঁচে যায়। চিরটা জীবন তা হলে গ্যাঁড়াপোতায় খুঁটোয় বাঁধা থেকে জীবনটা জলাঞ্জলি দিতে হবে। এ সুযোগ আর কি আসবে জীবনে? সে তার মাকে বোঝাল, ধরো, আমি তোমার আর একটা মেয়েই, তাকে বিয়ে দিয়ে বেড়াল-পার করছ। এর বেশি তো আর কিছু নয়।

ঘরজামাই থাকা মানে জানিস? শ্বশুরবাড়িতে মাথা উঁচু করে থাকতে পারবি ভেবেছিস? তারা তোকে দিয়ে চাকরের অধম খাটাবে। দিনরাত বউয়ের মন জুগিয়ে চলতে হবে। এ যে বংশের মুখে চুনকালি দেওয়া।

বাপের সঙ্গে কথা চলে না। তবে বাপ সবই শুনল, শুনে বলল, কুলাঙ্গার, বিয়ের বাই চাপলে মানুষ একেবারে গাধা হয়ে যায়।

তলিয়ে ভাবলে গাধার চেয়ে ভালই বা কী ছিল বিষ্ণুপদ? দু' বেলা দু' মুঠো খাওয়া আর অচ্ছেদ্দায় দেওয়া লজ্জা নিবারণের কাপড় জামা, এ ছাড়া আর কীসের আশা ছিল বাপ মায়ের কাছে। গাধা বলায় তাই দুঃখ হল না বিষ্ণুপদর। সে মাকে আড়ালে বলল, ধরো, তোমার একটা ছেলে বখেই গেছে বা মরেই গেছে। গাধা গোরু যাই হই আমার আখের আমাকে দেখতে দাও তোমরা। গলার দড়িটা খুলে দাও শুধু।

হরপ্রসন্ন—অর্থাৎ তার ভাবী শ্বশুর লোক মারফত খোঁজ নিচ্ছিল। বিষ্ণুপদর বাবা সেই লোকদের কড়া কড়া কথা শোনাতে লাগল। তা একদিন জোঁকের মুখে একেবারে এক খাবলা নুন পড়ে গেল। হরপ্রসন্নর এক অমায়িক ভাই দুর্গাপ্রসন্ন এসে বিষ্ণুপদর বাপকে কড়কড়ে হাজার টাকা গুনে দিয়ে বলল, বরপণ বাবদ আগাম পাঠিয়ে দিলেন দাদা। বিয়ের আসরে আরও হাজার।

হরপ্রসন্ন মানুষকে প্রসন্ন করতে পারতেন বটে। বাপের মুখে খিল পড়ল, মুখখানাও হাসি-হাসি হয়ে উঠল। মাও আর রা কাড়ে না। শুধু চোখের জল মুছে একদিন বলল, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কি মাকে মনে থাকবে রে বাপ? ওরা বড় মানুষ, টাকায় ভুলিয়ে দেবে।

কথাটা ভাঙল না বিষ্ণুপদ। ভাঙলে মা দুঃখ পাবে। সে আসলে ভুলতেই চায়। ভাবী শ্বশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মাথাটা নুয়ে আসছিল বারবার।

বাবা আর এক ভাই গিয়ে পাত্রীও দেখে এসে বলল, দেখনসই কিন্তু নয়। তবে গাঁ-ঘরে চলে যাবে। এ বাড়িতে তো আর থাকতে আসবে না, আমি মত দিয়েই এসেছি।

পাত্রী কেমন তা বিষ্ণুপদ জানত না। কথাটা তার খেয়ালই হয়নি। লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি

পাওয়াটাই তখন বড় কথা। পাত্রী সুন্দরী না বান্দরী তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছুই ছিল না। গ্যাঁড়াপোতা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাচ্ছে এই ঢের।

আর বিয়েটাও হল দেখার মতো। বাদ্যি বাজনা ঠাট ঠমক জাঁকজমকে পাত্রী চাপা পড়ে গেল কোথায়। শুভদৃষ্টির সময় এক ঝলক দেখে কিছু খারাপ লাগল না বিষ্ণুপদর। কম বয়সের, কিন্তু চটক আছে একটা। পাত্রী নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো অবস্থাও তখন তার নয়। তাকে নিয়েই তখন হই-চই। চারদিকের লোক জামাইয়ের চেহারা দেখে ধন্য ধন্য করছে। এতদিন পর জীবনে প্রথম একটা কাজের কাজ করেছে বলে আনন্দে দেমাকে বুঁদ হয়ে গেল বিষ্ণুপদ।

বিচক্ষণ হরপ্রসন্ন গোপনে নাকি বউ-ভাতের খরচাটাও জুগিয়েছিল। গ্যাঁড়াপোতায় সেই প্রথম ও শেষবার আসা বিষ্ণুপদর বউ পাপিয়ার। মোট বোধহয় দিন সাতেক ছিল। ওই সাতদিনে তাকে যথেষ্ট উত্যক্ত করেছিল বিষ্ণুপদর হিংসুটে বোনেরা। মাও খোঁচানো কথাবার্তা বলত। বড়লোকের মেয়ে বলে কথা। তার ওপর বাড়ির ছেলেকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়িতে পাপিয়াকে রেখে গ্যাঁড়াপোতায় ফিরল বিষ্ণুপদ। তখন তিনটে মাস বড় জ্বালা যন্ত্রণায় কেটেছে। কেউ কথা শোনাতে ছাড়েনি। গঞ্জনা একেবারে মাত্রা ছাড়া হয়ে উঠেছিল। কথা ছিল জামাইষষ্ঠীতে পাকাপাকিভাবে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে বিষ্ণুপদ। সুতরাং বাড়ির লোক ওই তিনমাস সুদে আসলে উশুল করে নিল। বিষ্ণুপদ কারও কথার জবাব দিল না, ঝগড়া কাজিয়া করল না। তার সামনে সুখের ভবিষ্যৎ। কটা দিন একটু সয়ে নিল দাঁত চেপে। শ্বশুরবাড়িতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তোয়াজে আদরে একেবারে ভাসাভাসি কাণ্ড। চাইবার আগেই জিনিস এসে যায়। ডাইনে বাঁয়ে চাকরবাকর। লটারি জিতলেও ঠিক এরকমধারা হয় না।

তবে সব কিছুর মূলেই ছিলেন শ্বশুর হরপ্রসন্ন। কী চোখেই যে দেখেছিলেন বিষ্ণুপদকে। সব জায়গায় সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। কাজকারবার, চাষবাস, মামলা মোকদ্দমা, ধানকল-আটাচাকি, গাঁয়ের মোড়ল মুরুব্বি থেকে শুরু করে সরকারি আমলাদের সঙ্গেও ভাব-ভালবাসা ছিল তাঁর।

সম্বন্ধীরা কি আর ভাল চোখে দেখছিল এইসব বাড়াবাড়ি? চার সম্বন্ধীই বিয়ে করে সংসারী। ছেলেপুলে আছে। ভবিষ্যৎ আছে। তারা কি বিপদের গন্ধ পায়নি এর মধ্যে? খুবই পেয়েছিল এবং পেছন থেকে তাদের বউদেরও উস্কানি ছিল, আরও উসকে দিচ্ছিল বউদের বাপের বাড়ির লোকজন।

বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অশান্তি হচ্ছিল বেশ। কিন্তু হরপ্রসন্নর মাথায় গোবর ছিল না। তিনি আগেভাগেই জানতেন, এরকমধারা হবেই। মেয়ের নামে আলাদা বাড়ি, কিছু জমি আর একখানা কাঠচেরাইয়ের কল করে রেখেছিলেন। ছেলেদের ডেকে একদিন তিনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়সম্পত্তির বাঁটোয়ারা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ বাবারা, কোনও অবিচার যদি করে থাকি তো এইবেলা বলে ফেল। তা হলে গাঁয়ের পাঁচটা লোক সালিশে বসুক এসে। আমার মনে হয় সেটা ভাল দেখাবে না।

ছেলেরা একটু গাঁইগুঁই করলেও শেষ অবধি মেনে নিল। তারা কিছু কম পায়নি।

হরপ্রসন্ন তাঁর বিশাল বাস্তুজমি পাঁচভাগ করে দেয়াল তুলে দিলেন। আগুপিছু এবং পাশাপাশি পাঁচখানা বাড়ি হল। নিজের নামে বড় বাড়িখানা শুধু রইল। বেঁচে থাকতেই সংসারের শান্তির জন্য ছেলেদের পৃথগন্ন করে দিলেন। শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে থেকে থেকেই সংসারের চোখ ফুটল বিষ্ণুপদর। বিষয়বুদ্ধি হল। কেনাবেচা, আদায়-উশুল লোক চরিত্র সব শিখল। শ্বশুরই ছিল তার গুরু। ফচকে নিতাই বলত, বাপু হে, তুমি দেখছি বিয়ে বসেছ তোমার শ্বশুরের সঙ্গেই।

তবে হ্যাঁ, সবটাই এমন সুখের বৃত্তান্ত নয়। তার বউ পাপিয়া বড় অশান্তি করেছে। কথায় কথায় কান্না, আবদার, রাগ। সে ঘরজামাই থাকুক এটা পাপিয়া একদম চাইত না। এমন কথাও বলত, তুমি তো আমার বাবার চাকর। বিষ্ণুপদ মধুর সঙ্গে এইসব ছোটখাটো হুল হজম করে গেছে। কারণ সত্যি কথাটা হল, বউকে নয়, শ্বশুরকে খুশি করতেই প্রাণপণ চেষ্টা করত বিষ্ণুপদ। সে বুঝত এই একটা লোকের কাছে তার কদর আছে।

প্রথম প্রথম যতটা খাতির-যত্ন ছিল তা কালধর্মে কমে গিয়েছিল। তা যাক, এক জায়গায় স্থায়ীভাবে থিতু হয়েছিল সে। সেইটেই বা কম কী? জমিজমা, চালু কারবার, দিব্যি বাড়ি, ছেলেপুলেও হতে লাগল। প্রথমটায় মেয়ে, তারপর দুই ছেলে।

সেই মেয়েরই জামাই ওই গোবিন্দ। শ্বশুর মরার পরই বিয়েটা হয়েছে। বড় সম্বন্ধী পরিতোষই এই বিয়ের প্রস্তাবটা নিয়ে আসে। পাল্টি ঘর, অপছন্দের কিছু ছিল না। বিয়ে হয়েও গেল। তবে জামাই কেমন যেন একটু ফণা-তোলা সাপের মতো। একটুতেই কেমন যেন রোখা-চোখা ভাব দেখায়।

তাকে ভাবিত দেখে সাতকড়ি এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলল, তোমার বরাত হল সোনার ফ্রেমে বাঁধানো। নিজের বিয়ে যেমন বোমা ফাটিয়ে করলে, মেয়েটারও তেমনি।

২

পোলের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্ত ঝুঁকে নদী দেখছিল। ব্যাটারা পোলটা বানিয়েছে ভাল। দিব্যি তকতকে জায়গা। বর্ষাবাদল না থাকলে শুয়ে ঘুমোনো যায়। বসে ভাত খাওয়া যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে পোলের তলায় সেঁধিয়ে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকলেই হল। পোলটা হয়ে ইস্তক কৃষ্ণকান্ত এখানেই থানা গেড়েছে। বড় পছন্দের জায়গা। কত উঁচু! এখানে দাঁড়ালে কতদূর অবধি দেখা যায়, আর হাওয়া-বাতাসও খেলে।

সবাই জানে না, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত খবর রাখে, পোল বাঁধতে তিনটে নরবলি হয়েছিল, বাজঠাকুরকে পাঁচখানা পাঁঠা মানত করতে হয়েছিল। তাতেও হয়নি। রোজ ব্যাটারা থাম বানাত আর নিশুত রাতে হারুয়া-ভূত এসে থাম নড়িয়ে গোড়া আলগা করে রেখে যেত। শেষে বাতাসপুরের শ্মশান থেকে হাতে-পায়ে ধরে নকুড় তান্ত্রিককে এনে ভূত বশ করতে হয়েছিল।

কিন্তু এত করেও লাভটা হল লবডঙ্কা। পোল বানানো হল বলে বাঁকা নদী রাগ করে সেই যে শুকোনো শুরু করল, এখন তো লোপাট হওয়ার জোগাড়। শালারা নদীকে গয়না পরাতে গিয়েছিল। বেহদ্দ বেকুব না হলে মা মুক্তকেশীকে কেউ গয়না পরায়? বাঁকা নদীর জলে চান করলে আগে পুণ্যি হত। কৃষ্ণকান্ত রোজ নিশুত রাতে পোলের তলায় শুয়ে শুনতে পায়, হারুয়া-ভূত নদীর দু ধারে দুই ঠ্যাং ফাঁক করে রেখে ছ্যাড়ছ্যাড় করে নদীতে পেচ্ছাপ করছে। এখন খা শালারা ভূতের মুত।

কৃষ্ণকান্ত রেলিং থেকে ঝুঁকে নদী দেখছে আর আপনমনে হাসছে। নদীর যত বৃত্তান্ত তা তার মতো আর কেউ জানে না। নন্দবাবুর মেয়ে শেফালি পোল থেকে লাফিয়ে পড়ে ম'লো—এ বৃত্তান্ত সবাই জানে। বিষ্ণুপদর ছেলে জ্ঞানের সঙ্গে তার একটু ইয়ে ছিল। টের পেয়ে নন্দবাবু খুব ঠ্যাঙায়। অপমানে শেফালি এসে ঝাঁপ খেল। কিন্তু কেউ জানে না, বাঁকা নদী কিছুদিন হল খুব ডাকাডাকি করছিল শেফালিকে। পরীক্ষায় ফেল হয়ে বিশ্বেসদের ফটিকও ঝাঁপ খেল। সে কি এমনি এমনি? বাঁকা রোজ সব কচিকাঁচা ছেলেপুলেকে ডাকছে। একটি দুটি করে এসে ঝাঁপ খাবে আর মরবে।

তারপর যে কাণ্ডখানা হয় সেটাও কেউ টের পায় না। কৃষ্ণকান্ত পায়। মরা মেয়ে বা ছেলের জন্য মা-বাপেরা যখন কান্নাকাটি করছে তখন শেফালি দিব্যি বাঁকা নদীর বালিয়াড়িতে দাগ কেটে এক্কাদোক্কা খেলে আর ছুটোছুটি করে বেড়ায় মনের আনন্দে। ফটিকই বা কোন দুঃখে আছে? হারুয়াভূতের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বটফল-নাটাফল পাড়ে আর খায়। ভরদুপুরে পোলের তলায় ছায়ায় শুয়ে শুয়ে আধবোজা চোখে সব দেখতে পায় কৃষ্ণকান্ত। মাঝে মাঝে হরপ্রসন্নবাবু এসে পোলটার দিকে চেয়ে খুব রাগারাগি করেন, এত জল ছিল নদীতে, সব গেল কোথায়? অ্যাঁ! গেল কোথায় অত জল? এই বলে ইয়া বড় বড় ঢ্যালা তুলে পোলের গায়ে ভটাভট ছুঁড়ে মারেন। ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা।

পোলটাকে ঘুরেফিরে সারাদিনই দেখে কৃষ্ণকান্ত। ঝাঁ ঝাঁ করে যখন বাস আর লরি পার হয় তখন শব্দটা যা ওঠে তাতে বুকটা ঝনঝন করতে থাকে। পোলের তলায় বসে থাকলে মনে হয়, এই বুঝি সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আবার যখন বাতাস বয় তখন পোলটার গায়ে বাতাসের ঘষটানির শব্দটা কেমন যেন বড় বড় শ্বাসের আওয়াজ তোলে।

রেলিংটা বেশ চওড়া। উঠে হাঁটাহাঁটি করা যায়। মজাও খুব। কৃষ্ণকান্ত উঠে পড়ল রেলিং-এর ওপর। তারপর হাঁটতে লাগল। বাঁ ধারে বাঁকা নদীর খাদ, ডানধারে পাকা রাস্তা। বেশ লাগছে তার।

পোলের মুখে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে চাকা বদলাচ্ছে। ক্লিনারটা চেঁচিয়ে বলে, এই শালা পাগল, পড়ে যাবি যে!

কৃষ্ণকান্ত খুব হাসে, পড়ব মানে! পড়লেই হল। এ হল আমার পোল। সেঁটে ধরে রাখে।

এদিককার লোকগুলো সুবিধের নয়। বড্ড লাথিঝাঁটার ঝোঁক এদের। যতদিন হরপ্রসন্ন বেঁচে ছিলেন ততদিন তেমন চিন্তা ছিল না কৃষ্ণকান্তর। চণ্ডীমণ্ডপে পড়ে থাকত। হরপ্রসন্ন মরার পর চণ্ডীমণ্ডপ গেল ঘরজামাই বিষ্ণুপদর ভাগে। সে ব্যাটা বজ্জাতের ধাড়ি। প্রথমটায় চোখ রাঙিয়ে, পরে মেরে ধরে তাড়াল। গিয়ে উঠেছিল হাটখোলার এক চালার নীচে। চৌকিদার শিবু এসে একদিন বলল, প্রতি রাতের জন্য চার আনা করে পয়সা লাগবে। তা সেখান থেকেও উঠতে হল। কিন্তু শালারা বুঝতে চায় না যে, মানুষের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা চাই। এই পোলটা হয়ে ইস্তক তার একখানা ঘরবাড়ি হয়েছে। পোলের তলায় ওপরে যেমন খুশি শোয়, বসে থাকে, ঘুরে বেড়ায়, কারও কিছু বলার নেই।

একটা বাস ঢুকছে কুসুমপুরে। জানলা দিয়ে লোকগুলো হাঁ করে তাকে দেখছে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, গেল শালা মায়ের ভোগে।

না, অত সহজে যাচ্ছে না কৃষ্ণকান্ত। পোলের রেলিং ধরে সে রোজ হাঁটাহাঁটি করে। সে বুঝতে পারে, এ হল তার নিজের পোল। সরকার বাহাদুর তার জন্যই বেঁধে দিয়েছেন। এ হল তার তেতলা বাড়ি। পুব ধারের প্রান্তে এসে আবার ঘুরে পশ্চিমধারে এগোতে থাকে সে।

ছাতা মাথায় গুটিগুটি হেঁটে একটা লোক আসছিল। তাকে দেখে একটা লাফ মেরে পোলের শানের ওপর নামল কৃষ্ণকান্ত।

ঘরজামাই যে, একখানা বিড়ি ছাড়ো তো!

লোকটা দাঁড়াল। তার দিকে চাইল। তারপর বলল, পোলটা দিব্যি বাপের সম্পত্তি পেয়ে গেছিস দেখছি।

বাপের বাপ বড় বাপ। এ হল সরকার বাহাদুরের জিনিস। দেবে নাকি একখানা বিড়ি?

বিড়ি? তোর সাহস তো কম নয় দেখছি!

এতক্ষণ রেলিংয়ের ওপর খেলা দেখালুম যে! সারা দিনমান দেখাই। তবু কোনও শালা কিছু দেয় না, জানো?

কস্মিনকালে আমাকে বিড়ি সিগারেট পান খেতে দেখেছিস?

কৃষ্ণকান্ত একটু অবাক হয়ে বলে, বিড়ি খাও না? খাও না কেন বলো তো ঘরজামাই! বিড়ি তো খুব ভাল জিনিস।

ঘরজামাই! বলে খেঁকিয়ে ওঠে বিষ্ণুপদ, ঘরজামাইটা আবার কী রে? তোর তো দেখছি বেশ মুখ হয়েছে!

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর হয়ে বলে, খারাপটা কী বললুম শুনি! তুমি হরপ্রসন্নবাবুর ঘরজামাই হয়ে এসেছিলে না এ গাঁয়ে?

তাতে তোর বাপের কী? বলে, ছাতাটা ফটাস করে বন্ধ করে বিষ্ণুপদ। লক্ষণটা ভাল নয়। ছাতাটা যেমন জুত করে ধরেছে, পেটাতে পারে।

না এই বলছিলুম আর কী। কৃষ্ণকান্ত দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, বিড়ি না দাও দশটা বিশটা পয়সাও তো দিতে পারো। সরকার বাহাদুর এত বড় পোলটা আমার জন্য বানিয়ে দিতে পারলেন, আর তোমরা এটুকু পারো না?

এঃ, সরকার বাহাদুর তেনার জন্য পোল বানিয়েছেন! তোর বাপের পোল!

কৃষ্ণকান্ত বুঝল, হবে না। সব সময়ে হয় না। মাঝে মাঝে আবার হয়েও যায়। লোকটাকে ছেড়ে কৃষ্ণকান্ত পোলের নীচে নেমে এসে ছায়ায় বসল। বেশ জুত করে বসল। মাথার ওপর ছাদ, চিন্তা কীসের?

একটা বিড়ি হলেও হত, কিন্তু না হলেও তেমন কষ্ট নেই। তার মাথায় হঠাৎ একটা কথা এল। আচ্ছা ঘরজামাই থাকলে কেমন হয়? ঘরজামাই থাকা তো খারাপ কিছু নয়। বিষ্ণুপদ কিছু খারাপ আছে কি? দিব্যি আছে। এতদিন কথাটা খেয়াল হয়নি তো তার। এদিককার লোকগুলোও যেন কেমনধারা, একবার ডেকে তো বলতে পারে, ওরে কেষ্টপাগলা, ঘরজামাই থাকবি? কেউ বলেওনি, তাই কৃষ্ণকান্তর খেয়াল হয়নি।

ঘরজামাই থাকার মেলা সুবিধে। কাপড়জামা জুতো ছাতা সব বিনি মাগনা পাওয়া যাবে। চারদিকে দেয়ালওলা ঘর হবে। দু বেলা দিব্যি খ্যাঁট। কাজকর্মও নেই। বগল বাজিয়ে মজাসে থেকে যাও। বিষ্ণুপদ যেমন আছে।

ইস, কথাটা আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। কিন্তু আর দেরি করাটাও ঠিক নয়। এইবার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা দরকার। কৃষ্ণকান্ত উঠে পড়ল।

রাস্তায় নামতেই কে যেন হাঁক মারল, ওরে কেষ্টা, বলি হন হন করে চললি কোথা?

দিল পিছু ডেকে। কৃষ্ণকান্ত ফিরে দেখে সাতকড়ি। লোকটা বড় ভাল নয়। একখানা জলচৌকি করে দিতে বলেছিল কৃষ্ণকান্ত, বহুদিন হল ঘোরাচ্ছে। জলচৌকি হলে কৃষ্ণকান্তের একটু সুবিধে হয়। পোলের তলায় উবু হয়ে বসে থেকে থেকে হাঁটু দুটোয় ব্যথা। জলচৌকি হলে দিব্যি গা ছেড়ে বসে আরাম করা যেত। তা সাতকড়ি কখনও না করেনি। শুধু বলে রেখেছে, বিশ্বাসবাবুদের বড় কাঁঠালগাছটা কাটা হলেই সেই কাঠ দিয়ে বানিয়ে দেবে। বিশ্বাসবাবুদের বড় কাঁঠালগাছটা প্রায়ই গিয়ে দেখে আসে কৃষ্ণকান্ত। বে-আক্কেলে গাছটা মরেও না, পড়েও না। এবারও রাজ্যের কাঁঠাল ফলেছে। তবে সে নজর রাখছে।

সাতকড়ি সঙ্গ ধরে বলে, বড় ব্যস্ত দেখছি যে!

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর হয়ে বলে, কাজে যাচ্ছি।

এ গাঁয়ে দেখলাম, একমাত্র তুই-ই কাজের লোক। সারাক্ষণ কিছু না কিছু করছিস।

কৃষ্ণকান্তর হঠাৎ মনে পড়ল, সাতকড়ির তিনটে না চারটে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে। পাত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে কবে থেকে। কৃষ্ণকান্ত গলাটা একটু নামিয়ে বলল, সাতকড়িদাদা, আমাকে ঘরজামাই রাখবে?

সাতকড়ি একটু থমকাল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বলে, ঘরজামাই থাকতে চাস নাকি?

আজ ঠিক করে ফেললাম ঘরজামাই হয়েই থাকা ভাল। চারদিকে দেয়াল, মাথার ওপর ছাদ, দুবেলা খাওয়া, সকাল বিকেল চা। কী বলো! বিষ্ণুপদ কেমন আরামে আছে দেখছ তো!

সাতকড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর মতো জামাই পেলে কে না লুফে নেবে বল! আমিও নিতুম। তবে কি না আমরা হচ্ছি গরিব মানুষ। নিজেদেরই ঘরে ঠাঁই হয় না, তো জামাইকে রাখব কোথায় বল।

আমি বারান্দাতেও পড়ে থাকতে রাজি।

তুই তো রাজিই, কিন্তু জিনিসটা ভাল দেখায় না। শত হলেও জামাই বলে কথা, তার খাতিরই আলাদা। তার ওপর ধর আমাদের খাওয়াদাওয়াও তো শাক জুটলে অন্ন জোটে না। ঘরজামাই যদি থাকতে চাস তো তারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কে যেন বলছিল সেদিন, ঠিক মনে পড়ছে না, ভাল একটা পাত্র পেলে খবর দিতে। ঘরজামাই রাখবে।

কে বলো তো!

একটু বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দেখ তো। যার দরকার সে ঠিকই বেরিয়ে এসে তোকে ধরবে।

মা কালীর দিব্যি কেটে বলছ তো!

ওরে হ্যাঁ রে হ্যাঁ। ফিরিওলারা যেমন হাঁক মেরে মেরে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে তেমনি হাঁক মেরে মেরে গাঁটা একটা চক্কর দিয়ে আয়। সবাইকে জানান দিতে হবে তো। একটু বেশ গলা ছেড়ে হাঁক মারবি, ঘরজামাই রাখবে গো-ও-ও। ঘর-জামা-আ-আ-ই। পারবি না?

কৃষ্ণকান্ত খুশি হয়ে বলল, এ আর শক্ত কি?

যা লেগে পড় কাজে। হিল্লে হয়ে যাবে।

তেমাথার মোড়ে সাতকড়ি ভিন্ন পথ ধরল।

কেউ যদি একটু ধরিয়ে দেয় তা হলে সব কাজই কৃষ্ণকান্ত ঠিকঠাক করতে পারে। ধরিয়ে দেওয়ার লোকই যে সব সময়ে পাওয়া যায় না, এইটেই কৃষ্ণকান্তর মুশকিল। এই যে সাতকড়িদাদা এ বেশ ভাল লোক। কী করতে হবে, কেমন করে করতে হবে তা ধরিয়ে দিল। এখন বাকিটা জলের মতো সোজা। হাঁক মারতে মারতে কৃষ্ণকান্ত পুবপাড়ায় ঢুকে পড়ল।

মল্লিকবাড়ির বউ মালতী উঠোন ঝেঁটিয়ে ধানের তুষ তুলে রাখছিল হাঁড়িতে, সেই প্রথম ফিরিওলার ডাকটা শুনতে পেল। কিন্তু কী হেঁকে যাচ্ছে তা বুঝতে না পেরে আগড় ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

ওরে ও কেষ্ট, কী বিক্রি করছিস? হাতে তো কিছু দেখছি না!

কেষ্ট রাস্তা থেকে নেমে এসে এক গাল হেসে বলল, ঘরজামাই রাখবে আমাকে?

মালতী হেসে গড়িয়ে পড়ল, ওরে সুবাসী, দৌড়ে আয়, ছুটে আয়। দেখসে পাগলা কী বলছে!

ছোট বউ সুবাসী এল, বাড়ির আরও মেয়েরা বেরিয়ে এল। হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল তাদের মধ্যে।

কৃষ্ণকান্ত বুঝল হবে না। বেশির ভাগ সময়েই হতে চায় না। মাঝে মাঝে হয়। কৃষ্ণকান্ত ফের পথে নেমে পড়ল।

গড়াইদের বাড়ির বুড়ো মদন গড়াই ক্ষেতের কাজ করছিল। হাতের দাখানা নেড়ে তেড়ে এল বেড়ার ধারে, ব্যাটা নতুন চালাকি ধরেছে! খুব বিয়ের শখ হয়েছে, হ্যাঁ!

কৃষ্ণকান্ত আরও একটু এগিয়ে গেল। এগোতে এগোতেই বুঝতে পারল সে বেশ একখানা কাণ্ডই বাঁধিয়েছে। কেউ হাসছে, কেউ তাড়া করছে, কেউ গাল দিচ্ছে। তবে হাসির দিকটাই বেশি। ছেলেপুলেরাও লেগেছে পাছুতে। দু' চারটে ঢিলও পড়ল গায়ে। নানা কথা কানে আসছে, পাগলা বলে কী রে...কে করবে লো, ঘরজামাই থাকবে...বসবি নাকি বে ওলো নিত্যকালী, পোলের নীচে থাকবি ঘর বেঁধে...মরণ...কে যেন ক্ষেপিয়েছে আজ পাগলাকে...এঃ, শালার আজ বড় রস উথলেছে দেখছি...

গোবিন্দ খেতে বসেছিল ভিতরের বারান্দায়। তাকে ঘিরে শালিরা। সামনে শাশুড়ি। কচি বউ ঘোমটা টেনে দরজায় দাঁড়ানো। থালা ঘিরে বাটি। ঠিক এই সময় পাগলার হাঁক শোনা গেল। ছোট ফ্রক পরা শালি পটলী ছুটে গিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ফিরে এল, এ মা, কী অসভ্য! বলছে, ঘর-জামাই রাখবে গো ঘর-জামাই!

শাশুড়ির মুখখানা কালো হয়ে গেল, কে বলছে রে?

কে আবার! কেষ্টপাগল।

গোবিন্দ হাসি চাপতে গিয়ে এমন বিষম খেল যে খাওয়া বরবাদ হওয়ার জোগাড়। অন্য শালিরাও হাসছে। তাদের কারোও গায়ে লাগছে না। তাঁরা সব মামাতো শালি।

গোবিন্দ চেয়ে দেখল, দরজায় তার বউটাও নেই। পালিয়েছে। বোধহয় লজ্জায়।

৩

হাতে কলমে না করলে চাষের মর্ম বোঝা কোনও শর্মার কর্ম নয়। চাষা যখন চষে তখন সে মাটির সঙ্গে কথা কয়, বলদের সঙ্গে কয়, লাঙলের সঙ্গে কয়, মেঘ-বাদল-রোদের সঙ্গে কয়, বাজঠাকুরের সঙ্গে কয়, সাপখোপের সঙ্গে কয়, নিজের কপালের সঙ্গে কয়, এমনকী ভগবানের সঙ্গেও কয়। এই সব কটা জিনিস মিলিয়ে তবে চাষ। কত তোতাই পাতাই করে, সোহাগ করে, মিতালি পাতিয়ে তবে এক একজনের সঙ্গে ভাবসাব হয়। তার চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে প্রাণ। মাটির ঢেলাটাও তার কাছে জ্যান্ত, লাঙলটা কাস্তেটা সবই জ্যান্ত। এরা সব সতীশের বন্ধু-বান্ধব। ছাঁচতলায়, উঠোনে যে সব গোখরো ঘুরে বেড়ায় তারাও বাস্তুর লক্ষ্মী—সতীশ তাদেরও বন্ধু মনে করে। সেদিন চাষের মাঠে এক কেউটে সুমুখে পড়ে কোমর অবধি ফণা তুলল। শানানো কাস্তে ছিল সতীশের হাতে, এক চোপাটে কেটে ফেলতে পারত। কিন্তু কাটেনি। শুধু বিড়বিড় করে বলেছিল, ধান কাটতে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি বাপু, মাপ করে দাও। কেউটেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফণা নামিয়ে চলে গেল। ঝড় বাদলার দিনে ভারী বাতাস আসে, চালাঘর উড়ে যেতে চায়, যায়ও। ছেলেপুলে বউ নিয়ে সতীশ জড়সড় হয়ে বসে থাকে শুধু। জানে ঝড় দুনিয়ার নিয়মে আসে, তারও বিষয়কর্ম আছে। ঘাসের মতো মাথা নুইয়ে থাকতে হয়, ঝড় কিছু করে না গরিবের ক্ষতি। মেঘের ওপর থেকে বাজঠাকুর যখন বজ্রের বল্লম ছুঁড়ে মারেন তখনও সতীশ নিশ্চিন্তে ক্ষেতে কাজ করে। জানে, মরার হলে কেউ কি ঠেকাতে পারবে?

প্রাণ, চারদিকে কেবল প্রাণের খেলা দেখতে পায় সতীশ। সবাই ভারী জ্যান্ত, ভারী বন্ধুর মতো।

আগে বাঁকা নদীতে জল ছিল খুব। উপচে পড়ত। আজকাল আর জল নেই। বালির ওপর বালি জমা হয়ে উঁচুতে উঠেছে নদীর খাত। একধার দিয়ে শুধু নালার মতো জল বয়ে যায়। যখন জল ছিল, তখন বাঁকা নদীর জল ছেঁচে ক্ষেত ভাসিয়েছে সতীশ। আজকাল একটু কষ্ট, বর্ষাবাদল না হলে ক্ষেত জল পায় না। নদীকেও কেমন মানুষ-মানুষ লাগে সতীশের। সেও যেন কিছু বলে, কিছু শোনে।

ভারী ঠাণ্ডা সুস্থির সতীশের জীবন। সকাল থেকে রাত অবধি তার খাটুনির শেষ নেই। ক্ষেতে চাষ, বলদ গোরু, কুকুর বেড়াল কাক সকলের যত্নআত্তি করা, ছেলেপুলে বউ সকলের পালনপোষণ আছে, গাছপালা আর পঞ্চভূত আছেন। সকলকেই সতীশ খুশি রাখতে চেষ্টা করে। কেউ জানে না, তার দুটো হেলে বলদ কখন হাসে কখন কাঁদে। তার গোরুটা কখন উদাস হয়ে যায়। তার কুকুর চারটে, তার তিনটে বেড়াল এদেরও কি ঠিক মতো কেউ বুঝতে পারে, সতীশ ছাড়া? বাতাসে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, রাতবিরেতে যাদের দেখলে লোকে ভিরমি খায়, তাঁদেরও টের পায় সতীশ। গভীর রাতে মাঝে মাঝে সে যখন ঘুম ভেঙে উঠে মহাবিস্ময়ে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে তখন টের পায়, কারা যেন বাতাসের মধ্যে বাতাসের শরীর নিয়ে মিশে কাছাকাছি আসে। একটু গা শিরশির করে তার।

একদিন বেহান বেলায় ঘাড়ে ভারী লাঙ্গল আর দুটো বলদ নিয়ে মাঠে যাচ্ছে সতীশ। আলের ওপর মুখোমুখি একটা ফুটফুটে ছেলের সঙ্গে দেখা। পরনে হেঁটো ধুতি, খালি গা। কী যে সুন্দর তার মুখচোখ। সতীশ হাঁ করে দেখছিল। ছেলেটা তার কাছাকাছি এসে একগাল হেসে বলল, এই দেখ, আমি দাঁত মেজেছি। আমার হাতে দেখ একটুও ময়লা নেই। আমি আজ কোনও দুষ্টুমি করিনি।

এত সুন্দর করে বলল যে ওই সামান্য কথাতেই কেন যেন জল এল সতীশের চোখে। সে ধরা গলায় বলল, তোমার ভাল হবে বাবা, তুমি বড় ভাল ছেলে।

ছেলেটা খুশি হয়ে নদীর ধার দিয়ে কোথায় চলে গেল। সতীশ কাউকে কিছু বলেনি, বলতে নেই। মনে মনে সে জানে, সেদিনই সে ভগবানকে দেখেছে।

দুপুরবেলা দুটো তৃষ্ণার্ত বলদকে একটা মাটির গামলায় নুন মেশানো জল খাওয়াচ্ছিল সতীশ। উঠোনে একটা ছায়া এসে পড়ল।

সতীশ, আছিস নাকি রে?

মনিবকে দেখে সতীশ তটস্থ হল। বাঁকা নদীর পোল পেরিয়ে মনসাতলা দিয়ে টুকটুক করে ছাতাটি মাথায় দিয়ে উনি নিত্যই আসেন। আসেন, এসে চাষের সময় ক্ষেতের ধারে আলের ওপর বসে থাকেন। ধান ঝাড়া হলে দেখতে আসেন। ধান মাপবার সময় দেখতে আসেন। কী দেখেন তা সতীশ জানে। বিঘে প্রতি যা ন্যায্য পাওনা হয় তা সতীশ বরাবর তুলে দিয়ে আসে মনিবের গোলায়। খরা বা বান হলে কম বেশি হয়।

মেয়ে খেঁদি দৌড়ে গিয়ে একটা জলচৌকি এনে পেতে দিল দাওয়ায়। মুখের ঘামটি কোঁচায় মুছে মুনিব বসলেন। ফর্সা মুখখানা রোদের তাতে রাঙা হয়ে আছে। চুল আর গোঁফ কিছু পেকেছে, তবু মান্যিগন্যি করার মতোই চেহারা।

খেঁদির কাছে চেয়ে এক ঘটি জলের অর্ধেকটা খেয়ে নিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ আছিস তোরা।

এ কথাটার মানে হয় না। শুনলে লজ্জা করে সতীশের। ভাল থাকা মন্দ থাকার সে কীই বা জানে। তবে মেখেজুখে আছে, মিলেমিশে আছে। চারদিকটার সঙ্গে তার ভারী ভাবসাব। মনে হয় পোকাটা মাকড়টা অবধি তাকে চেনে জানে।

সে মনিবের সামনে উঠোনে উবু হয়ে বসে বলে, দুটো ডাব পাড়ি?

ডাব! না রে, এ দুপুরে তোকে আর গাছে উঠতে হবে না।

কিছু নয় কর্তাবাবু। হনুমানের মতো উঠব আর নামব। যাওয়ার সময় কয়েকটা গন্ধরাজ লেবু নিয়ে যাবেন। এবার মেলা ফলেছে।

ডাবটা আস্তে আস্তে খেতে খেতে মনিব বললেন, সেই শ্বশুরমশাইয়ের আমল থেকে তোকে দেখে আসছি। একই রকম রয়ে গেলি। তুই বুড়ো হস না?

সতীশ মাথা চুলকে বলে, বয়স ভাঁটিয়ে গেছে অনেক দিন। সে কি আর আজকের কথা! বুড়োও

হচ্ছি নিশ্চয়ই, বয়স তো হলই।

সেইরকম পাকানো চেহারা, শক্তপোক্ত, সারাদিন রোদে জলে খাটিস, বয়স মানিস না, তোর রকমটা বুঝতে পারি না।

ওই আজ্ঞে একরকম। চাষাভুষোর শরীর তো।

ওরে, আমিও পালোয়ান কিছু কম ছিলুম না। দেখেছিস তো সেই চেহারা!

আজ্ঞে দেখিনি আবার! সব চোখের সামনে ভাসছে। যেদিন বিয়ে করতে এলেন নৌকো করে, পালকি ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। বুড়োকর্তার সে কী আহ্লাদ। কার্তিকের মতো জামাই হয়েছে।

আর লজ্জা দিস না। আজকাল নড়তে চড়তে হাঁফ ধরে যায়।

শরীর তো কিছু বেজুত দেখছি না আমি। অনেকটা সেইরকমই আছেন।

বিষ্ণুপদ উদাস চোখে মাঠঘাট পেরিয়ে কোন উধাওয়ের দিকে যেন চেয়ে থাকে। তারপর একটু ধরা-ধরা গলায় বলে, বিষয়-বিষয় করেই বোধহয় এরকম ধারা হল, কী বলিস!

গন্ধরাজ লেবু ক'টা কুয়োর জলে ধুয়ে এনে দাওয়ার ওপর রেখে সতীশ বলে, আপনার বিষয় না থাকলে আমার পেট চলত কী করে? আপনার জমিতে চাষ, আপনার ভুঁয়েই বাস।

বিষ্ণুপদ বড় বড় চোখে কেমন বিকল একরকম নজরে সতীশের মুখের দিকে চেয়ে বলে, ঠিক জানিস?

কীসের কথা বলছেন?

এ জমি যে আমার, এই চাষবাস যে আমার!

তা কে না জানে! হরপ্রসন্নবাবু আপনার নামে লিখে দেননি এসব?

কর্তাবাবুর আজ বড় বড় শ্বাস পড়ছে, লক্ষ করে সতীশ। মুখখানাও ভার। আজ বাবুর মনটা ভাল নেই। মন নিয়ে কারবার নেই সতীশের। তার মন বলে কি বস্তু নেই? থাকলেও ঠাহর পায় না। সকাল না হতেই কাজে নেমে পড়তে হয়। শরীর বেটে দিতে হয়, জান চুয়াতে হয়, তবে মাঠে মাঠে ফলন্ত মা লক্ষ্মীকে দেখা যায়। তখন শরীরে কেমন একখানা ফুরফুরে হাওয়া এসে লাগে।

বিষ্ণুপদ ডাবের খোলাটা সতীশের বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিয়ে ধুতির খুঁটে মুখ মুছে বলেন, লিখেই তো দিয়েছিলেন রে। তুই তো লেখাপড়া শিখিসনি, দলিলে কী লেখা থাকে তাও জানিস না।

সতীশ গম্ভীর মাথা নেড়ে বলে, তা অবশ্য জানি না। তবে এটা মনে হয় কোন জমিটা কার তা স্পষ্ট করে বলা থাকে দলিলে।

তাও থাকে। তবে আমরা হচ্ছি ভাড়াটে। আসল জমি হল সরকার বাহাদুরের। ভোগ দখল বিক্রি, বা বিলিব্যবস্থার অধিকার আছে মাত্র। সরকার ইচ্ছে করলেই কেড়ে নিতে পারে।

সতীশ মাথা নেড়ে বলে, সে কথাও ঠিক নয়। এই আলো বাতাস এসব তো সরকার বাহাদুরের নয়, নাকি?

আলো বাতাস! তা কী করে সরকারের হতে যাবে?

তা হলে জমিও নয়। দুনিয়াটা যার এসব হচ্ছে তারই জিনিস।

বিষ্ণুপদ সতীশের দিকে মায়াভরে চেয়ে থেকে বলে, তোর মধ্যে এই একটা জিনিস আছে। এটাই তোকে বুড়ো হতে দেয় না। এর জন্যই এই বয়সেও তোর গায়ে মোষের মতো জোর। তোর মতো নয়, তাহলেও শ্বশুরমশাইয়ের মধ্যেও এরকম একটা ব্যাপার ছিল।

তিনি ছিলেন আমার অন্নদাতা দেবতা। ওরকম মানুষ হয় না।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, তুই তো সবার মধ্যেই ভগবান দেখতে পাস। এ খুব ভাল। আমাকে শেখাবি কী করে সব কিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখতে হয়?

সতীশ লজ্জায় মুখ নিচু করে হাসে, কী যে বলেন তার ঠিক নেই। আমি শেখাব কি? মুখ্যু সুখ্যু মানুষ আমরা। ওসব আস্পর্ধার কথা শুনতে নেই। তবে এটা জানি, জমির মালিক যদি আপনি না হন তবে সরকার বাহাদুরও নয়। আপনার যা বন্দোবস্ত সরকার বাহাদুরেরও তাই।

বুঝেছি রে। আর বোঝাতে হবে না। তুই সবকিছুর মধ্যে ভগবান দেখিস, আর আমি দেখি বিষয়।

তাই দেখেন কর্তাবাবু, তাই ভাল করে দেখেন।

বিষ্ণুপদ একটু ম্লান হেসে বলে, দূর পাগল! বিষয়ের মধ্যে আছেটা কী? তাও যদি নিজের জোরে করতে পারতুম তো বলার মুখ থাকত। এ হল গিয়ে পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। শ্বশুরমশাই ঘর-জামাই করতে চাইল, তখন বড় গরিব ছিলুম তো, বাপের কাছে কলকে পেতুম না, তাই নেচে উঠেছিলুম। ভাবলুম না জানি চারখানা হাত গজাবে। এসে সাজানো সংসারে ঘটের মতো বসলুম। ফক্কিকারিটা যদি তখনও বুঝতে পারতুম রে। আজ যেন কোথায় একটা খোঁচা টের পাচ্ছি।

মানুষকে দুঃখ পেতে দেখলে সতীশের কেমন যেন জলে-পড়া অবস্থা হয়। সে একটু ব্যগ্র হয়ে বলে, তা এর মধ্যে খারাপটা কীসের দেখলেন? আমি তো কিছু খারাপ দেখছি না!

খারাপ নয়! পাঁচজন কি আর আমাকে ভাল বলে রে? আড়ালে রঙ্গ রসিকতা করে, আমি টের পাই। সম্বন্ধীরাও ভাল চোখে দেখে না। এমন কী বউ ছেলেপুলেরাও নয়। এই তো আজ জামাই এল, তার ভাবখানা যেন লাটসাহেবের মতো, শ্বশুর বলে যে কেউ একজন আছে তা গায়েই মাখতে চায় না।

সতীশ মাথা চুলকোয়। বাবুর সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে তা ঠিক ধরতে পারছে না সে। এই হল মুশকিল। নিজেকে বাবু-টাবুদের জায়গায় বসিয়ে তো আর ভাবতে পারে না। তার তো ওসব বড় বড় সমস্যা নেই। তবু সে বলল, জামাই তো দিব্যি আপনার। এই তো সেদিন বে হল। গাড়ি চেপে জামাই এল, কাছ থেকে বেশ করে দেখলুম।

বিষ্ণুপদ ঠাট্টা করে বলে, কী দেখলি? ভগবান নাকি?

সতীশ একটু লজ্জা পেয়ে বলে, কিছু খারাপ নয় তো।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, খারাপ কাউকে বলি কী করে? খারাপ আমার কপাল। ভাবছি এখানে তোর কাছাকাছি একখানা ঘর তুলে থাকব। আমাকে তুই একটু চাষের কাজ শেখাবি?

কী যে বলেন তার ঠিক নেই।

তোর সঙ্গে থেকে থেকে চাষবাস শিখব, বুড়ো বয়সকে ঠেকাতে শিখব, আর ভগবান দেখতে শিখব। শেখাবি?

আজ বাবুর কথাগুলো বড় উঁচু উঁচু দিয়ে চলে যাচ্ছে। সতীশ নাগাল পাচ্ছে না। কী বলতে হবে তাও মাথায় আসছে না তার।

ঠিক এই সময়ে তার বউ সুরবালা রান্নাঘর থেকে ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় আধখানা বেরিয়ে এসে বলল, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। বাবুকে বলো এখানেই স্নান করে দুটি খেয়ে যেতে।

বিষ্ণুপদ গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে বলে, সে কথাটাও মন্দ নয়। খাওয়াবি নাকি রে সতীশ দুটি ভাত?

সতীশ এত অবাক হল যে বলার নয়। বাবু খাবেন! তার বাড়িতে? সে উত্তেজিত হয়ে বলে, কচুঘেঁচু কী রান্না হয়েছে কে জানে! এ কি আপনি মুখে দিতে পারবেন? কত ভাল খাওয়া-দাওয়া হয় আপনাদের।

রোজ তো নিজের মতোই খাই। আজ না হয় তোর মতোই খেয়ে দেখি। তেলটেল থাকলে দে। স্নানটা করে আসি।

এই যে দিই।

বলে সতীশ ছোটাছুটি শুরু করল। তেল এনে দিল। নিজেই গিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলল। একখানা নতুন গামছা কিনেছিল হাট থেকে। সেইটি বের করে দিল। বিষ্ণুপদ যে সত্যিই তার বাড়িতে খেতে বসবে এটা যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তার।

বিষ্ণুপদ সত্যিই স্নান করে এসে খেতে বসে গেল।

খেতে খেতে বলল, আমার মা এখনও বেঁচে আছে তা জানিস? গ্যাঁড়াপোতায় আমাদের বাড়ি। বহুকাল যাওয়া হয়নি। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে এমন মজে আছি যে—

সতীশ কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। মিনমিন করে বলল, মোটা চালের ভাত, গিলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে খুব।

ছেলেবেলায় এই মোটা চালের ভাতই জুটতে চাইত না। কষ্ট ছিল খুব, আর কষ্টে থাকলে মানুষ কত কী করে ফেলে। শ্বশুরমশাই এমন লোভানীতে ফেলে দিলেন যে সব ছেড়েছুড়ে একেবারে

পুষ্যিপুত্তুরটি হয়ে চলে এলুম। একটা বড় লাফ মেরে খানাখন্দ সব ডিঙিয়ে এলুম বটে, কিন্তু একবার ফিরে দেখা তো উচিত ছিল ভাইরা, বোনরা, আমার মা-বাবা তারা ডিঙোতে পারল কি না। উচিত ছিল না, বল?

সতীশ সুরবালার দিকে চেয়ে বলে, বাবুকে আর একটু ডাল দাও বরং। আর একটু চচ্চড়িও নিন। ঝাল হয়নি তো বাবু?

ঝালটাই তো ব্যঞ্জন ছিল রে। ভাত পাতে আর কীই বা জুটত! শুধু লঙ্কা। বোনগুলোর একটাও ভাল বিয়ে হয়নি শুনেছি। ভাইগুলোও বড় কেউকেটা হয়নি। বাবা দুঃখে কষ্টে গেছে। মাটা এখনও ধুকধুক করে বেঁচে আছে।

সতীশ উঁচু হয়ে বসে পাতে আঁকিবুকি কাটছে। তার হল চাষাড়ে খিদে। যখন খেতে বসে তখন অন্ন ব্যঞ্জনের স্বাদ পায় না, গোগ্রাসে শুধু গিলে যায়। চোখের পলকে পাত সাফ। আজ তার ভাত যেন উঠতেই চাইছে না। পাহাড়প্রমাণ পড়ে আছে পাতে।

আপনার পেট ভরল না বাবু।

বিষ্ণুপদ খুব ধীরে ধীরে উঠে পড়ল। আঁচিয়ে এসে বলল, এই দাওয়াতেই একটা মাদুর পেতে দে, একটু গড়িয়ে নিই। এখানে দিব্যি হাওয়া আছে।

সতীশের মেয়ে খেঁদি একটা পান সেজে এনে দিল। পান খায় না বিষ্ণুপদ। তার কোনও নেশা নেই, এক বিষয় সম্পত্তির নেশা ছাড়া। তবু আজ পানটা খেল।

আমাদের বালিশ বড় শক্ত কর্তাবাবু। তুলোর বড্ড দাম বলে পুরনো ন্যাকড়া-ট্যাকরা ভরে খোল সেলাই করে নিই। আপনার অসুবিধে হবে।

তুই অনেকক্ষণ ধরে কেবল ভদ্রতা করছিস। কাছে এসে বোস।

সতীশ বসল।

আধশোয়া হয়ে অনেকক্ষণ আবার সামনের মাঠঘাটের দিকে চেয়ে চেয়ে পান চিবোয় বিষ্ণুপদ। তারপর বলে, মানুষ যে কী চায় সেটাই তো বুঝতে পারে না। তুই বুঝিস?

সতীশ ঘনঘন মাথা চুলকে বলে, ক্ষেতে কিছু লাল শাক হয়েছে। খেঁদি তুলে দেবে'খন। নিয়ে যাবেন। মা ঠাকরুণ লাল শাক বড় ভালবাসেন।

আমাকে একটা ঘর করে দিবি? ওই ক্ষেতের মাঝখানটায় হবে। চারদিকে ধানক্ষেত থাকবে, মাঠ ময়দান থাকবে, গাছপালা থাকবে। একা একা বেশ থাকব। দিবি?

এবারও ধান ভাল হবে না। ক্ষেতে জল না হলেই বড় মুশকিল। নদীটাও শুকোল।

বালিশে মাথা রেখে বিষ্ণুপদ চোখ বুজল। আপন মনে বলল, কত বয়েস হয়ে গেল রে।

৪

পাগলাটাকে আজ বেধড়ক পিটিয়েছে ছানু। একেবারে অমিতাভ বচ্চনের কায়দায়। সে একা নয়, তাদের শীতলা মাতা স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেরাও ছিল। তবে তারা বেশি মারেনি। ছানুরই রাগটা বেশি চড়ে গিয়েছিল। ঘর-জামাই রাখবে! ঘর-জামাই রাখবে বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করলে কার না রাগ হয়! জামাইবাবু খেতে বসেছে সবে, এমন সময় কোথা থেকে পাগলাটা এসে হল্লা জুড়ে দিল। তার বাবা ঘর-জামাই ছিল বলে একটু চাপা কানাকানি হাসি মশকরা বরাবরই শুনে আসছে ছানু। আজকের বাড়াবাড়িটা তাই সহ্য হয়নি।

কিন্তু মারটা একটু বেশি হয়ে গেছে। নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল, একটা চোখ কালশিটে পড়ে বুজে গেছে, কাঁকালেও জোর লেগেছে। কোঁকাতে কোঁকাতে অজ্ঞান মতো হয়ে গিয়েছিল।

খাওয়া ফেলে গোবিন্দই এসে জাপটে ধরল তাকে, করছটা কী? মেরে ফেলবে নাকি?

ছানু তখনও রাগে ফুঁসছে, কত বড় সাহস দেখলেন! বাবাকে অপমান!

গোবিন্দ ঠাণ্ডা গলায় বলল, নিজেদের ঘাড়ে নিচ্ছ কেন? পাগলরা কত কিছু করে, তার কি কিছু ঠিক আছে? এঃ, এর যে খুব খারাপ অবস্থা!

ক্লাবের ছেলেরাই দৌড়ে জল নিয়ে এল। বহুক্ষণ জলের ঝাপটাতেও কাজ হল না।

গোবিন্দ গম্ভীর মুখ করে বলল, ভিক্ষে করে খায়, কখনও তাও জোটে না, ওর কি এত মার খাওয়ার মতো ক্ষমতা আছে শরীরে? দেখছ না কেমন হাড়-বের-করা চেহারা, দুর্বল!

ছানু একটু ভয় খেয়ে গিয়েছিল তখন। যদি মরে টরে যায় তা হলে কী হবে? সে একটু কাঁপা গলায় বলল, ওরকম না বললে কি মারতুম?

গোবিন্দ শালার দিকে কঠিন চোখে চেয়ে বলল, পাগল আর দুর্বল বলেই মারতে পেরেছ, নইলে কি পারতে?

গোবিন্দ গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে কৃষ্ণকান্তের নাকে অনেকক্ষণ ধোঁয়া দিল। কাজ হল না তাতে।

পাগলটা বড্ড টানা মারছে শরীরটাতে। খিঁচুনির মতো।

এ গাঁয়ে ডাক্তার নেই? গিরীন না কে একজন ছিল না?

ক্লাবের একটা ছেলে বলে, হ্যাঁ, আমার কাকা। কাকা তো বেলপুকুর গেছে।

গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, রাস্তায় ফেলে রাখা ঠিক হবে না। তোমরা ধরো ওকে। দাওয়ায় তুলে শুইয়ে দাও। এ বোধহয় আজ খায়নি, পেটটা খোঁদল হয়ে আছে।

ক্লাবের ছেলেরা ধরাধরি করে, চণ্ডীমণ্ডপে তুলে শোয়াল কৃষ্ণকান্তকে। কে একটা পাখা নিয়ে এসে মাথায় বাতাস করতে লাগল।

ছানুকে ভিতর বাড়িতে নিয়ে গেল তার দিদি, এই তোকে মা ডাকছে।

পাপিয়া—অর্থাৎ ছানুর মা ছেলের দিকে চেয়ে বলে, খুন করেছিস নাকি পাগলটাকে?

তুমিই তো আমাকে ডেকে বললে পাগলটা কী সব অসভ্য কথা বলছে, গিয়ে দেখতে।

তা বলে অমন মারবি?

বেশি মারিনি। বেকায়দায় লেগে গেছে।

জামাই তোকে কী বলছিল? বকছিল নাকি?

জামাইবাবু মনে হয় রেগে গেছে।

এ কথায় তার দিদি আর মায়ের মুখ শুকোল।

পাপিয়া চোখের জল মুছে বলে, বিয়ের পর দু মাসও কাটেনি, এর মধ্যে জামাইকে কে যে ওষুধ করল কে জানে, বিষ নজরে দেখে আমাদের। মেয়েকে নেওয়ার নামটিও করে না। কেমন যেন রোখা-চোখা রাগ-রাগ ভাব। সাতবার খবর পাঠিয়ে আনিয়েছি, এ নিয়ে কথা বলব বলে। দিলি সব ভণ্ডুল করে। জামাই আরও রেগে রইল। এখন কী হবে?

কী হবে তার ছানু কী জানে? তবে গোবিন্দদা যে তাদের বিশেষ পছন্দ করে না এটা সে টের পায়। কিন্তু মাথা ঘামায় না। সংসারের সম্পর্ক টম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে তার ভাল লাগে না।

পাপিয়া চোখের জল মুছে বলে, সব অশান্তির মূলে ওই একটা লোক। লোভী, স্বার্থপর, অন্ধ। বিয়ের পরই আমি পই পই করে বলেছিলাম, ওগো, বাবার সম্পত্তি আঁকড়ে পড়ে থেকো না, নিজের পায়ে দাঁড়াও। চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। মতিচ্ছন্ন হলে কি কেউ ভাল কথা কানে নেয়? বাবার পিছনে পিছনে চাকরবাকরের মতো ঘুরত। গাঁয়ে কত হাসাহাসি হয়েছে তাই নিয়ে, গ্রাহ্যও করত না।

মেয়ে মুক্তি বলল, ওসব কথা থাক তো এখন। চণ্ডীমণ্ডপে ভীষণ ভিড় জমে গেছে। আমার ভয় করছে।

পাপিয়া আর একবার চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে কাঁদল। তারপর মুক্তিকে বলল, কিছু টাকা বার করে ক্লাবের ছেলেদের হাতে দে। নাটাগড়ের হাসপাতালে ওকে নিয়ে যাক। মরলে সেইখানেই মরুক, এখানে যেন না মরে।

মুক্তি চলে গেলে ছানুর দিকে চেয়ে পাপিয়া বলে, জামাই যখনই আসে অমনি ওরা এসে জোটে।

কারা মা?

তোর মামাতো দিদি আর বোনেরা। ওরাও মাথাটা খাচ্ছে। মুক্তির দিকে ফিরেও চায় না। শালিদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করে ফিরে যায়।

বিরক্ত হয়ে ছানু বললে, এখন একটা বিপদের সময় কেন যে জামাই নিয়ে পড়লে!

বিপদ তো তুই-ই বাঁধিয়েছিস মুখপোড়া। সংসারের কত রকম বিপদ আছে তা জানিস?

ছানু রাগে দুঃখে ঠোঁট কামড়ায়। বুকে বড্ড ভয়ও তার। মাথাটা কেমন করছে যেন। সে ক্যারাটে মারার কায়দায় একখানা লাথিও কষিয়েছিল পাঁজরে। সত্যিই মরে যাবে নাকি পাগলটা?

সে ঘুরে সদর দরজার কাছে এসে দূর থেকে ভিড়টা দেখতে পেল। তার দিদি মুক্তি গোবিন্দদার সঙ্গে কী যেন কথা বলছে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। গোবিন্দদার মুখটা লাল টকটক করছে। খুব রাগের সঙ্গে কী যেন বলছে। মুক্তি বোধহয় কাঁদছে। বারবার আঁচল তুলছে চোখে।

মরে গেল নাকি?

আজ বাজারে একটা সিনেমা দেখানো হবে। শিবা। দারুণ ঝাড়পিটের ছবি। ফিল্মটা দেখবে বলে কতদিন ধরে শানিয়ে রেখেছিল ছানু। অবস্থা যা দেখছে তাতে ফিল্ম দেখা লাটে উঠল।

এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার। পাগলটার জন্য দরদ উথলে উঠবে মানুষের। অথচ লোকটা যে খেয়ে না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে রোজ মরতে মরতে বেঁচে ছিল তখন দরদটা ছিল কোথায়? যে কোনও দিন বাঁকা নদীর পোলের ওপর থেকেও তো পড়ে মরতে পারে। রোজ রেলিং-এর ওপর উঠে এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পায়চারি করে।

ভিড়ের ভিতর থেকে একটা চেঁচামেচি ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছে, কে মেরেছে রে? বাপের জমিদারি পেয়েছে নাকি? যা তো বলাগড় থানায় গিয়ে একটা খবর দিয়ে আয় তো, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাক।

আর একজন খুব তেজের গলায় বলে, ঘর-জামাই রাখার কথায় বাবুদের খুব আঁতে লেগেছে বোধহয়। সাতে পাঁচে নেই পাগলটা, পোলের নীচে পড়ে থাকত। ইস, একেবারে খুনই করে ফেলেছে!

ধরে দে না ঘা কতক ছোঁড়াটাকে টেনে এনে। পালাল কোথায়?

ছানু কী করবে বুঝতে পারছে না। তার বীরত্বও উবে গেছে।

মাথাটা কেমন কেমন লাগছে।

গোবিন্দকে দেখতে পেল ছানু, ভিড় সরিয়ে চণ্ডীপণ্ডপে উঠে গেল। গোলমালটা একটু কম। সবাই খুব মন দিয়ে নিচু হয়ে কী যেন দেখছে। ভগবান! মরে যাচ্ছে নাকি? এবারকার মতো বাঁচিয়ে দাও ভগবান! জীবনে আর কারও গায়ে হাত তুলব না।

ছানু বিহ্বল হয়ে অবশ শরীরে শুয়ে পড়ল বারান্দায়।

কতক্ষণ শুয়ে আছে তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখতে পেল তার দিদি মুক্তি এক গ্লাস গরম দুধ আঁচলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দ্রুত পায়ে।

চোখ মেলেছে! চোখ মেলেছে। চিৎকার উঠল একটা।

ভগবান! বলে ডেকে কেঁদে ফেলে ছানু। পাঁচ সিকে মানত করে ফেলে শীতলা মায়ের কাছে। একটা শোরগোল উঠল চণ্ডীমণ্ডপে।

কেষ্ট পাগলা উঠে বসেছে। দুধ খাওয়ানো হচ্ছে তাকে। একরকম জড়িয়ে ধরে আছে তাকে গোবিন্দ। দুধ খাওয়াচ্ছে।

মারমুখো ভিড়টাকে শেষ অবধি সামলে নিল গোবিন্দই। উঠে দাঁড়িয়ে জোরালো গলায় ধমকের সুরে বলল, যে যার বাড়ি যান। এখানে ভিড় করে লাভ নেই। কৃষ্ণকান্তর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। এখন হাওয়া-বাতাস খেলতে দিন।

ভিড়টা পাতলা হতে লাগল। শেষ অবধি রইল গোবিন্দ, মুক্তি আর ক্লাবের দুটো ছেলে, যারা ছানুর বন্ধু।

গোবিন্দ হাতছানি দিয়ে ডাকল ছানুকে। ছানু দুর্বল পায়ে গিয়ে দাঁড়াল চণ্ডীমণ্ডপের কাছটিতে। কখন একটা শতরঞ্চি পেতে বালিশে শোয়ানো হয়েছে কৃষ্ণকান্তকে। চোখ মিটমিট করছে। ঠোঁটে একটু ভ্যাবলাকান্ত হাসি। পাগল বলে কথা, সে কি আর মারধোর অপমানের কথা মনে রাখে। গোবিন্দ ছানুর দিকে চেয়ে বলে, কেসটা খুব খারাপ করে ফেলেছিলে।

ছানু শুকনো গলায় বলে, আর হবে না।

খুব ভয় পেয়েছ না।

ছানু চুপ করে থাকে।

আর ভয়ের কিছু নেই। কৃষ্ণকান্ত মনে হচ্ছে, টিঁকে যাবে। গাঁয়ের লোক বলাবলি করছিল, ও নাকি আগে এই চণ্ডীমণ্ডপেই থাকত।

মুক্তি বলে, হ্যাঁ থাকত। নোংরা করে রাখে বলে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল।

তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপ, তোমরা যা ভাল বুঝেছ করেছ। কিন্তু লোকে ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি। হরপ্রসন্নবাবু নিজেই থাকতে দিয়েছিলেন ওকে। একধারে পড়ে থাকত। কী এমন ক্ষতি হচ্ছিল তাতে?

তার দিদি মুক্তির সঙ্গে জামাইবাবু গোবিন্দর যে তেমন বনিবনা হচ্ছে না, এটা ছানুও জানে। তার দিদি বোধহয় এ কথার জবাবে একটা বাঁকা কথা বলে বসত। সম্পর্কটা এভাবেই খাট্টা হয়ে যায়। ছানু ছলছল চোখে বলল, না, ক্ষতি কীসের? আমি বাবাকে রাজি করিয়ে ওকে রেখে দেব।

দেখো চেষ্টা করে। হরপ্রসন্নবাবুর মায়াদয়ার শরীর ছিল। অনেকের আশ্রয়দাতা ছিলেন। লোকে সেকথা এখনও বলে। সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে এখন পোলের নীচে থাকে।

এতক্ষণ ছেলে দুটো কোনও কথা বলেনি। এবার তাদের একজন বলল, পোলের নীচেও তো দুপাশ খোলা। ঝড় জল হলে ভেজে!

প্রাণেশ বলল, রেলিঙের ওপর উঠে রোজ হাঁটে। কবে যে পড়ে মরবে।

গোবিন্দ একটু গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে বলে, হরপ্রসন্নবাবুর বিষয়বুদ্ধিও ছিল, মহত্ত্বও ছিল। তার বিষয়বুদ্ধিটুকু শুধু নিলাম, মহত্ত্বটা নিলাম না এটা ভাল নয়।

খোঁচাটা কাকে তা টের পেল ছানু। কান একটু গরম হল।

মুক্তি বলল, এভাবে বলছ কেন? দাদু দাদুর মতোই ছিল, তা বলে সবাই তার মতো হবে নাকি?

সেই কথাটাই তো বলছি। সবাই কি আর ওরকম হয়? অনেকে শাঁসালো শ্বশুর পেয়ে মা-বাপকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে। যাকগে, একে একটু দেখো। আমার ফেরার বাসের সময় হয়েছে। আমি এবার উঠব।

মুক্তির মুখ রাগে অভিমানে ফেটে পড়ছে। গোবিন্দকে খবর দিয়ে না আনলে সেও আসতে চায় না। এলেও রাতে থাকে না। ছানু বোঝে, কোথায় একটা কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে। গোবিন্দদা বাবাকে একদম দেখতে পারে না। আর দিদি বাবাকে ভীষণ ভালবাসে। তাই কি ওদের ঝগড়া।

৫

হেগে মুতে ফেলে বলে ছেলেরা আর মাকে ঘরে থাকতে দেয় না। বারান্দায় হোগলার বেড়া তুলে ঘিরে দিয়েছে, সেই বেড়ারও ওপর নীচে ফাঁক। শীতের হাড়-কাঁপানো হাওয়া, বর্ষাবাদলা, ধুলো বালি, সাপ-ব্যাঙ সবই ঢোকে। দরজা বলে কিছু নেই। খাঁ খাঁ করছে একটা দিক। বেড়াল-কুকুর ঢুকে পড়ে অহরহ। শরীরে নানা রোগভোগ নিয়ে বুড়ি একখানা নড়বড়ে চৌকির ওপর পড়ে থাকে। এ একরকম ঘরের বার করে দেওয়া। একরকম বিদায় দিয়ে দেওয়া।

গ্যাঁড়াপোঁতায় দিদির বাড়িতে গেলে একবার করে যায় গোবিন্দ। বুড়ো মানুষদের ওপর তার এমনিতেই একটা টান আছে। পুরনো সব দিন যেন ঘিরে থাকে তাদের, কত গল্প শোনা যায়। তাদের কষ্ট গোবিন্দ ঠিক সইতে পারে না।

তার ওপর এ হচ্ছে সম্পর্কে তার দিদিশাশুড়ি। নাতজামাই এ গাঁয়ে আসে জেনে বুড়ি বড্ড কাকুতি মিনতি করে ধরেছিল গোবিন্দর দিদি দিমিকে। নাতজামাই এলে যেন একবারটি চোখের দেখা দেখতে পায়। তারপর গোবিন্দ প্রায়ই যায়। মানুষকে মানুষের এত অপমান করার অধিকার নেই। থাকতে পারে না। বুড়িকে তার ছেলেরা যেভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিচ্ছে এরকমটা কিন্তু কোনও বুড়ো মানুষেরই সঠিক পাওনা নয়। গোবিন্দর ইচ্ছে করে রাগে ফেটে পড়ে খুব অপমান করতে এদের।

এসে সে একখানা মোড়া পেতে কাছেই বসে থাকে। রসগোল্লা বা সন্দেশ নিয়ে আসে বুড়ির জন্য। বুড়ির নোংরা বিছানা বা কাপড় জামা, মুতের মেটে হাঁড়ি কিছুতেই সে ঘেন্না পায় না।

বুড়ি তার সাড়া পেলেই উঠে বসে। রোগা জীর্ণ চেহারা। রোগের যন্ত্রণায় চোখ মুখ বসে গেছে। তবু গোবিন্দ এলে ফোকলা মুখে খুব হাসে।

এসেছিস ভাই? তোকে দেখলে আমার প্রাণটা কেন ঠাণ্ডা হয় রে?

আপনার ঠাণ্ডা হয়, আর আপনার অবস্থা দেখলে যে আমার মাথা গরম হয়।

এরকমই তো হওয়ার কথা। সংসার বড় জঞ্জাল।

সংসার জঞ্জাল কেন হবে ঠাকুমা? সংসারকে জঞ্জাল বানালে তবেই তা জঞ্জাল হয়। আপনার ছেলেরা বড্ড অমানুষ।

বুড়ি ভয় খেয়ে বলে, ওরে, জো'র বলিসনি। শুনলে আমাকে খুব হেনস্থা করবে। একটু ওদের কথা বল, শুনি।

গোবিন্দ হাসে। ওদের কথা বলতে, বড় ছেলে আর তার সংসারের কথা। গোবিন্দ বলে, সে ছেলেও তো আপনাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে কেটে পড়েছে। বলি নাতি নাতনি কাউকে চোখে দেখেছেন?

বুড়ি থোঁতা মুখ করে বলে, কোত্থেকে দেখব বল! কে দেখাবে? তারা কি আর আসে? তবে ভাল থাকলেই ভাল।

ভাল থাকবে না কেন? দিব্যি ভাল আছে। আপনার ছেলে শ্বশুরের পয়সায় হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে।

তোর বউটা কেমন হল? ভাল? যত্ন আত্তি করে?

এখনও ভাল করে ঘরে আনিনি।

ওমা! তা কেন রে?

ইচ্ছে হয় না। মেয়েটা বড্ড মুখরা। একটু তেল মজিয়ে নি।

ত্যাগ দিবি না তো।

গোবিন্দ হাসে, বিয়ে করার ইচ্ছেই ছিল না আমার। বিয়ে করলেই নানারকম ভজঘট্ট পাকিয়ে ওঠে। আপনার নাতনিটিও সোজা নয়। বিয়ের রাতেই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল আলাদা বাসা করে থাকতে। সেই যে পিত্তি জ্বলে গেল, আর তা ঠাণ্ডা হল না।

তোর কিন্তু বড্ড রাগ ভাই। আমার নাতনিটাকে এনে একবার দেখাবি আমায়! তাকে দেখিনি তো কখনও। বড্ড দেখতে ইচ্ছে যায়। কবে মরে যাব, একবার মুখখানা দেখে রাখি। কেমন চেহারা রে? বাপের মতো মুখ পেয়েছে?

হ্যাঁ।

তা হলে দেখতে ভালই হবে। তোর পছন্দ তো?

চেহারা খারাপ নয়। আপনি তো তাদের কথা শুনতে চান, কিন্তু তারা কখনও আপনার কথা ভুলেও মুখে আনে না কেন ঠাকুমা? এটাই কি সংসারের নিয়ম?

বুড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শুনেছি বিষ্টু নাকি এ বাড়িতে খুব কষ্টে ছিল বলে তার রাগ আছে। বিয়ে করে বিদেয় হওয়ার জন্য বড্ড অস্থির হয়েছিল। তা সে তার ছেলেপুলে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলেই হল। এই বুড়ো বয়সে একটা কথাই কেবল মনে হয়, যে কটা দিন আছি যেন শোকতাপ পেতে না হয় আর। ওইটাই ভয়ের ব্যাপার, বুঝলি? ছেলেপুলে নাতি নাতনি যখন অনেকগুলো হয়ে যায় তখনই ভয় হয়, কোনটা পড়ল, কোনটা মরল। বড় জ্বালা।

বুঝেছি ঠাকুমা।

আর একটা হয়, সবাইকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। বিষ্টুর তো দুই ছেলেও আছে। তারা কেমন?

আর পাঁচটা ছেলের মতোই।

এই পোড়া চোখে তো আর দেখতে পাব না তাদের। তোর চোখ দিয়েই যেন দেখতে পাচ্ছি।

এত মায়া কেন বলুন তো ঠাকুমা। এত মায়া থাকলে যে শরীর ছাড়তে কষ্ট হবে।

বুড়ি একটু কেঁপে ওঠে, শরীর কি আর ছাড়তে চায় রে!

এত কষ্ট, তবু শরীর ধরে পড়ে আছি। পাপের মন তো, সহজে তাই মরতে দেয় না ভগবান। আরও অনেক ভোগাবে, তবে মারবে।

গোবিন্দ বসে বসে বুড়ির ঘরখানা দেখে। আদপে ঘরই নয়। একটা আব্রু মাত্র। রাতের বেলায়

ছেলেরা ঘরে দোর দিয়ে শোয়। বুড়ি বাইরে বেওয়ারিশ পড়ে থাকে। মানুষ যে কী করে এত হৃদয়হীন হয়।

শ্বশুরবাড়ি থেকে পর পর শাশুড়ির চিঠি এল। কুসুমপুর থেকে যারা নাটাগড়ে আসে তাদের হাত দিয়েই চিঠি পাঠায় শাশুড়ি। একটাই বয়ান। মেয়েকে কবে ঘরে নেবে গোবিন্দ। সংসারে মন দিতে আর ইচ্ছাই হয় না গোবিন্দর। সংসার বড় নিমকহারাম জায়গা। তার ওপর ওই বাপেরই তো মেয়ে, তার আর কতটুকু মায়া দয়া হবে? তার চেয়ে একাবোকা বেশ আছে সে। তার বাড়ির লোক বউ আনার জন্য খুব গঞ্জনা দেয়, বিশেষ করে মা। তবে সে মাথা পাতে না। গড়িমসি করে।

গত সপ্তাহেও গ্যাঁড়াপোতা গিয়ে বুড়িকে দেখে এসেছে গোবিন্দ। মনে হয়েছে, আর বেশিদিন নেই। বুড়ি বালিশের তলা থেকে একখানা তোবড়ানো সোনার আংটি বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, তোর বউকে দিস।

এটা আবার কেন? এ আমি নেব না। আপনার শেষ সম্বল এসব।

চুপ চুপ! গলা তুলতে নেই। আমার যা ছিল সব ওরা নিয়ে নিয়েছে। এটা অতি কষ্টে লুকিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। সম্বল বলিসনি, এ আমার শত্রু। অভাবের সংসারে গয়না সব অনেক আগেই গাপ হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ গাছা চুড়ি, দুটো ঝুমকো দুল, দুটি মাকড়ি আর তিনটে আংটি ছিল। এইটেই শেষ আংটি। টের পেলেই নিয়ে নেবে। এটা মুক্তির জন্য আমি রেখেছি।

কে রেখেছে কে জানে। তবে বুড়ি যার জন্য রেখেছে তার কাছে যে এই আংটির কোনও দাম হবে না তা গোবিন্দ ভালই জানে। মুক্তি তার বাপের একমাত্র মেয়ে বলে গয়নাগাঁটি মেলাই পেয়েছে। হরপ্রসন্ন নাকি নাতনিকে খুব ভালবাসতেন, বিয়ের গয়না তিনিও কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন। মুক্তি এই তোবড়ানো আংটির আসল দাম বুঝতে চাইবে কি?

কিন্তু গোবিন্দ বোঝে, আংটিটা মাথায় ঠেকিয়ে কাগজে মুড়ে পকেটে রেখে সে বলল, এ আংটির দাম লাখ টাকা।

সে তোর কাছে ভাই। তুই যে সোনার মানুষ।

এত চট করে সার্টিফিকেট দিয়ে বসবেন না। এখনও কিন্তু আপনার নাতনিকে নিয়ে ঘর করা শুরু করিনি। সংসারে পড়লেই কে কেমন বোঝা যায়।

তোদের সংসার কি আমি দেখতে যাব রে? এই যে তুই আমার কাছে আসিস এইতেই তুই সোনার মানুষ। বুড়ো-বুড়িদের কাছে কেউ আসতে চায় না রে ভাই, সারাদিন দুটো কথা কওয়ার লোক পাই না। আজকাল আরও কী হয়েছে জানিস, শুনলে হাসবি। আজকাল রাত বিরেতে বড় ভয় পাই।

কীসের ভয় ঠাকুমা?

দাওয়ার উত্তর দিকে ওই লেবু গাছটা দেখছিস তো!

দেখছি।

ওদিকটায় বেড়া দেয়নি ওরা। নিশুতরাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পাই কারা যেন সব এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওখান থেকে দেখছে আমাকে।

কারা? চোর ছ্যাঁচড় নয় তো?

না রে ভাই। এ বাড়িতে চোর ছ্যাঁচড়েরও আসবার প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় তোর দাদাশ্বশুর আসে, আমার এক ভাসুর, শাশুড়ি আরও সব কারা যেন। তারা কেউ জ্যান্ত মানুষ নয়।

তা হলে ভূত। বলে খুব হাসে গোবিন্দ।

বুড়ি হাসিটাকে গ্রাহ্য না করে বলে, তখন ভাই বড্ড ভয় করে। কত ডাকি ছেলেদের, বউদের, কেউ কোনও সাড়া দেয় না। হাতে পায়ে ধরে বলেছি, ওরে এদিকটাতে একটা বেড়া দিয়ে একটা ঝাঁপের দরজা করে দে। তাও কেউ গ্রাহ্য করে না।

ঠাকুমা, আমি যদি ভাল করে বেড়া দিয়ে ঘরখানা বেঁধে দিই তা হলে কী হয়?

কী জানি ভাই, তাতে বোধহয় আমার ছেলেদের আঁতে লাগবে। তোকে কিছু বলবে না, কিন্তু আমাকে দিনরাত ঝাঁপা ঝাঁপা করবে। কাজ কী তোর ওসব করতে যাওয়ায়? মাঝে মাঝে যে এসে দেখে যাস সেই আমার ঢের। এখন একটা মানুষ এসে দু'দণ্ড কাছে বসলে এত ভাল লাগে যে মনে হয়

আর কিছু চাই না। কেউ যে আসে না তাতেও দোষ দিই না কাউকে। হেগে মুতে ফেলছি, ঘরে নোংরা পড়ে থাকে, ঘেন্নায় আসে না। হ্যাঁ রে, তোরও ঘেন্না করে, তাই না?

গোবিন্দ মাথা নেড়ে হেসে বলে, আমার ওসব ঘেন্নাপিত্তির বালাই নেই। আমার এক কাকার পেটে ক্যানসার হয়েছিল। বাহ্যের দ্বার বন্ধ করে ডাক্তাররা পেটের বাঁ পাশে একটা কৌটো লাগিয়ে দিয়েছিল। তাইতে মল জমা হত, নিজে হাতে সেসব পরিষ্কার করেছি। রুগির সেবায় আমার খুব অভ্যাস আছে। আমাদের বাড়িতে কারও অসুখ বিসুখ হলে আমিই সব করি।

তবে কেন তুই সোনার ছেলে নোস বল তো? তোকে দেখেই যে বুকটা জুড়িয়ে যায় আমার।

রুগির সেবা তো নার্সরাও করে। তারাও কি সব সোনার মেয়ে! ওটা কথা নয়, আমার ঘেন্নার ধাতটাই নেই।

একটু কাছে আয়। তোর মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করি।

আশীর্বাদের কোনও দাম আছে কিনা গোবিন্দ জানে না। কিন্তু বুড়ির রোগা হালকা দুখানা হাত যখন তার একরাশ চুলওলা মাথায় থরথর করে কাঁপছিল তখন গোবিন্দর মনে হল, বুড়ির প্রাণটাই যেন হাত বেয়ে আঙুল থেকে চুঁইয়ে তার ভেতরে ঢুকে আসতে চাইছে। আশীর্বাদের যদি কোনও অর্থ হয় তবে এর চেয়ে বেশি আর কী হবে?

সেই তোবড়ানো আংটিটা নিয়ে এসেছিল আজ গোবিন্দ। মুক্তি সেটা হাতে নিয়ে খুশি হল না, কিন্তু অবাক হল, এটা কীসের?

তোমার ঠাকুমা দিয়েছে। আশীর্বাদ।

হঠাৎ এটা দেওয়ার মানে কী?

মানে কিছু নেই। আশীর্বাদের যদি কিছু মানে থাকে তবে এরও মানে আছে।

মুক্তি আংটিটা খুব হেলাভরে একটা দেরাজে রেখে দিয়ে বলে, তুমি বুঝি এখন খুব যাও ও বাড়িতে?

না। মাঝে মাঝে যাই। তুমি বোধহয় কখনওই যাওনি।

সেটা তো আর আমার দোষ নয়। ও বাড়ির সঙ্গে বাবারই সম্পর্ক নেই।

গোবিন্দ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সম্পর্ক যে কেন থাকে না সেটাই যে আমার মাথায় আসে না।

মুক্তি প্রসঙ্গটা এড়িয়ে অন্য কথায় চলে গেল।

রাগ গোবিন্দর সাধে হয় না। বুড়িটার লাঞ্ছনা আর অপমান যে একেবারেই অকারণ, কতগুলি নির্মম বেআক্কেলে মানুষের চূড়ান্ত স্বার্থপরতাই যে তার কারণ, এটা ভেবে তার মাথা আগুন হয়ে যায়।

তার শ্বশুর বিষ্ণুপদ বোধহয় গোবিন্দর নীরব রাগ আর ঘেন্না টের পায়, তাই গোবিন্দ এলেই একটু তফাত হয়, লুকোনোর চেষ্টা করে। এমন কী একসঙ্গে খেতে অবধি বসে না।

তার দুই শালি, অর্থাৎ মুক্তির ছোট মামার মেয়েরা বিকেলে আলুকাবলি করবে, খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল। নইলে আগেই চলে যেতে পারত গোবিন্দ। শালা ছানু পাগলটাকে মেরে বসায় যাওয়া হয়নি। গোলমালে আলুকাবলিও মুলতুবি রেখে গোবিন্দ রওনা হওয়ার জন্য চুল আঁচড়াতে যখন ঘরে এল তখন শাশুড়ি খুব কাঁচুমাচু মুখে ঘরের দরজায় এসে বললেন, উনি কিন্তু এখনও ফিরলেন না!

কে? কার কথা বলছেন?

তোমার শ্বশুর কখনও তো এত দেরি করেন না। আজ যে কী সব হচ্ছে।

গাঁয়েই কোথাও গেছেন-টেছেন হয়তো।

চারদিকে লোক পাঠিয়েছি। যেখানে যেখানে যান তার কোথাও নেই।

গোবিন্দ ঘড়ি দেখে নিল। বাস ধরবার জন্য মাত্র আধঘণ্টা সময় আছে। পা চালিয়ে হাঁটলে দশ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায়। কাজেই খুব দেরি হয়ে যায়নি।

তুমি যাচ্ছ বাবা?

হ্যাঁ। শেষ বাস পাঁচটায়।

আজকাল তো কিছুতেই তোমাকে একটি দিনও আটকে রাখতে পারি না। মুক্তির কী করবে তা কি ভেবেছ? বিয়ের পর তো অনেক দিন হয়ে গেল?

বলেছি তো, আরও কিছুদিন আপনাদের কাছে থাক। তারপর ভেবে দেখব।

ব্যাপারটা তো ভাল দেখাচ্ছে না। পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে।

আপনার মেয়ের মন এখনও তৈরি হয়নি। আমাদের বেশ বড় পরিবার। মানিয়ে গুছিয়ে চলা খুব সহজ নয়। তাই মন তৈরি হোক।

পাপিয়া খুব সংকোচের সঙ্গে বলে, আসলে বড় আদরে মানুষ তো। অত কাজকর্মের মধ্যে গিয়ে পড়লে খেই হারিয়ে ফেলবে।

গোবিন্দ চিরুনিটা পকেটে গুঁজে রেখে বললে, তা বলে তো আমিও আর ঘর-জামাই থাকতে পারি না।

শাশুড়ি বিবর্ণ মুখে বলে, সে কথা কি বলেছি বাবা?

আপনার মেয়ে আমাকে আলাদা সংসার করার প্রস্তাব দিয়েছিল। সেটা কোনওদিনই সম্ভব না। আমরা মা-বাপকে আস্তাকুঁড়ে ফেলতে শিখিনি।

গোবিন্দর হঠাৎ খেয়াল হল, তার গলা কিন্তু সপ্তমে পৌঁছে গেছে। এবং ভেতরে ভেতরে রাগের একটা ঝড় পাকিয়ে উঠছে। সে লজ্জা পেয়ে হঠাৎ চুপ করল। গুম হয়ে গেল।

তারপর গলা কয়েক পর্দা নামিয়ে এনে বলল, আপনি আর আমাকে চিঠি লিখে আনানোর চেষ্টা করবেন না।

পাপিয়া কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর বলল, আলাদা থাকা কি ঘর-জামাই থাকা বাবা?

তার চেয়ে খুব বেশি ভালও নয়। আমার আর সময় নেই। আমি যাচ্ছি।

আমার মনটা ভাল নেই বাবা, কী বলতে হয়তো কী বলেছি। তোমার শ্বশুরকে কিন্তু ঘরজামাই থাকতে আমিই বারণ করতাম। লোভে পড়ে হল, তার প্রায়শ্চিত্ত এখনও করতে হচ্ছে।

কান্না একদম সইতে পারে না গোবিন্দ। কেউ কাঁদলেই—তা সে কপট কান্না হলেও সে কেমন দ্রব হয়ে পড়ে। পাপিয়া দরজার কপাট দুহাতে আঁকড়ে ধরে তাতে মুখ গুঁজে কাঁদছিল।

দ্রব হলেও গোবিন্দ কখনও গলেও যায় না। সে গম্ভীর নিচু গলায় বলে, আপনি কাঁদছেন কেন! কান্নাকাটি দিয়ে তো এ জট খোলা যাবে না।

পাপিয়া তার হেঁচকি মেশানো কান্নার মধ্যেই বলে, তোমরা কি ভাব ওই লোকটা খুব সুখে আছে? একমাত্র বাবা ছাড়া প্রত্যেকে ওকে দিন রাত অপমান অবহেলা করেছে। আমাদের কাছেও সম্মান পায় না। নিতান্ত বেহায়া আর লোভী বলে বিষয় আঁকড়ে পড়ে থাকে।

ওঁর কথা টেনে আনছেন কেন? আমি তো আপনার মেয়ের কথা বলছিলাম।

তুমি তো ওঁকে দু'চোখে দেখতে পারো না। ও সেটা টের পায় বলেই তোমার সামনে আসে না। বোধহয় তুমি আছ বলেই চৌপর দিন কোথায় গিয়ে না খেয়ে বসে আছে।

তা হলে তো আমার না আসাই ভাল।

আমার কপাল! যা বলি তার উল্টো অর্থ হয়। আমি বলতে চেয়েছিলাম শ্বশুরকে অপছন্দ করো বলেই মুক্তিকেও তুমি সহ্য করতে পারো না।

আমি ওভাবে ভাবিনি। আপনারা যা খুশি হয় ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে আমার মনে হয়, চোখের জলটা আমার ওপর না খাটিয়ে আপনার মেয়ের ওপর খাটালে অনেক বেশি কাজ হত।

চোখের জলের কথা বলছ বাবা? আমার চোখের জল ধরে রাখলে এতদিনে সমুদ্র হয়ে যেত। বাকি জীবনটা কাঁদতে কাঁদতেই যাবে। আমি বলি কী, তুমি মুক্তিকে জোর করে নিয়ে যাও।

জোর করে মানে? চুলের মুঠি ধরে নাকি?

দরকার হলে তাই করবে। নিয়ে গিয়ে বাসন মাজাও, কাপড় কাচাও, ঘর মোছাও, লাথি মারো, খুন করো, তবু ওকে নিয়ে যাও।

তার মানে আমরা ওসব করি নাকি? লাথি মারি? খুনও করি?

পাপিয়া অসহায়ের মতো বিহ্বল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে একরকম ছুটে পালিয়ে গেল।

একথা ঠিকই যে, গোবিন্দর একটা ক্ষ্যাপাটে রাগ আছে। সেই চরম রাগটা উঠলে তার ভেতরটা শুধু আগুন আর মাথায় মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ হতে থাকে। কিন্তু এই রাগটা আর কারও তত নয়, যতটা

ক্ষতি করে তার নিজের। সে তখন কোনও কাজ করতে পারে না, ঘুমোতে পারে না, খেতে পারে না। শুধু ভেতরকার নিরুদ্ধ রাগে কাঁপতে থাকে।

সত্যিই হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল তার। একরকম টলতে টলতে মাতালের মতো সে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর চণ্ডীমণ্ডপ ডাইনে রেখে সোজা বাসরাস্তার দিকে হাঁটা দিল।

বাবু! বলি ও জামাইবাবু!

গোবিন্দ দাঁড়াল, পাগলটা না? সে তাকাতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল। এখন পাগলটার কাছে কেউ নেই। ফাঁকা চণ্ডীমণ্ডপে একা বসে আছে।

যাবে না-যাবে-না করেও গোবিন্দ গেল তার কাছে, কী বলছ?

কৃষ্ণকান্ত এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করে, বন্দোবস্তটা কীরকম হল? এই চণ্ডীমণ্ডপটা কি আমাকে দিয়ে দিলেন ঘরজামাই?

গোবিন্দ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সে পাত্র পাওনি।

তা হলে কী হবে এখন?

যতদিন পারো থাকবে। দুধটুধ খাওয়াতে পারে কয়েকদিন। গাঁয়ের থেকে চাপ দিলে থেকেও যেতে পারো।

কৃষ্ণকান্ত একটু বিরস মুখে বলে, পাকা কাজ হল না। ব্লড্ড দোটানায় পড়ে গেলুম যে! আপনি তো ঘোড়েল লোক, একটা বুদ্ধি করতে পারেন না?

আমার তত বুদ্ধি নেই।

কৃষ্ণকান্তকে ভাবিত দেখাল। বলল, সুবিধের জায়গা নয়। মজা নেই। বড্ড ভ্যাতভ্যাত করছে।

তাই নাকি? তবে ইচ্ছেটা কী?

এখানে পোষাবে না। আমার বাঁকা নদীর পোলই ভাল। ঘরজামাই যদি চণ্ডীমণ্ডপটা লিখে দিতে তা হলে বেশ হত। এটা বেচে দিয়ে জিলিপি খেতুম।

গোবিন্দ একটু ম্লান হেসে বলে, চলি হে। আমার আর সময় নেই।

একটু দাঁড়ান বাবু। মাজায় বড় ব্যথা, একটু ধরে তুলবেন?

উঠে কোথায় যাবে?

একটু কষ্ট করে আমাকে পোলের কাছে পৌঁছে দিন। সরকার বাহাদুর আমার জন্যই পোলটা বানাল। আমিই দেখিশুনি কিনা।

তাই বুঝি?

খুব মজা হয় সারাদিন। কত রগড় দেখতে পাই।

বলতে বলতে নিজেই উঠে পড়ল কৃষ্ণকান্ত। একটু ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

গোবিন্দ পাঁচটা টাকা তার হাতে দিয়ে বললে, নাও, জিলিপি খেয়ো।

টাকাটা ছেঁড়া জামার পকেটে রেখে নেমে এল কৃষ্ণকান্ত, দূর শালা? এটা একটা বাজে জায়গা, শতরঞ্চি বালিশ কি আমাদের পোষায়? পোলের নীচে দিব্যি থাকি। বাবু, বিড়ি দেবেন একটা।

নেই রে।

বিড়ি ছাড়াও চলে কৃষ্ণকান্তর। বিড়ি পেলেও চলে। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে গোবিন্দর পিছু পিছু এগোতে লাগল। গোবিন্দ মাঝে মাঝে তার দিকে ফিরে চাইছে। রাগটা কমে যাচ্ছে তার।

৬

ও কি আমার গু বউমা?

আপনার নয় তো আবার কার? বাড়িটা যে নরক বানিয়ে ফেলেছেন! এখন কে এসব পরিষ্কার করে বলুন তো! হাঁটতে তো একটু আধটু পারেন, আর উঠোনটুকু পেরোলেই তো পায়খানা। শয়তানি বুদ্ধি থাকলে কে আর কষ্ট করতে যায়, তাই না?

বুড়ি খুব দুশ্চিন্তা মুখ নিয়ে বলে, এ তো মনে হয় বেড়ালটার কাণ্ড বউমা।

বেড়ালের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আপনার ঘরে হাগতে এসেছে। লোক ডেকে পরিষ্কার করাতে পয়সা লাগে, বুঝলেন? ঘরভরা তো আর দাসি চাকর নেই। ছিঃ ছিঃ!

বুড়ি আজকাল বড় ভয় খায়। সারাটা দিন মনে শুধু ভয় আর ভয়। কখন বয়সের দোষে কোন অকাজটা করে ফেলে তার ঠিক কী? এরা কেউ ছাড়বার পাত্রপাত্রী তো নয়। বাক্যে একেবারে পুড়িয়ে দেয়।

বড় নাতনি নাচুনি এসে মাটির হাঁড়ির ভাঙা দুটো চারা আর এক খাবলা ছাই দরজার পাশে রেখে বলল, ও ঠাকমা, গুটা তুলে পিছনের কচুবনে ফেলে দিয়ে এসো।

বুড়ি নাতনির দিকে চেয়ে বলে, এই যে যাই।

উঠোনে দাঁড়িয়ে বড় বউ পুতুল পাড়া জানান দিয়ে চেঁচাচ্ছে, তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তবু কি নোলা বাবা। এটা দাও, সেটা দাও। গুচ্ছের খাবে আর ঘরদোর নোংরা করবে। সামলাতে যখন পারো না তখন খাওয়া কেন বাপু? কাল এই এককাঁড়ি কলমি শাক গিলল। তখনই বুঝেছিলুম ঠিক পেট ছাড়বে।

বুড়ি মন দিয়ে শুনছিল। গতকাল কলমি শাকই খেয়েছিল বটে। কিন্তু বুড়ির গলায় তত জোর নেই যে পাল্টা চেঁচিয়ে সবাইকে জানাবে, কলমি শাক ছাড়া আর কোনও পদই তাকে দেওয়া হয়নি।

নাচুনি চাপা গলায় বলে, তাড়াতাড়ি করো ঠাকমা, দেরি করলে আরও বকবে।

এই যে যাই।

মাথাটা আজ বশে নেই। কেমন যেন পাক খাচ্ছে। শরীর কিছুতেই খাড়া হতে চায় না। বুড়ি চৌকি থেকে নেমে নোংরাটার সামনে উবু হয়ে বসল। তারপর নাতনির দিকে চেয়ে বলে, এটা বেড়ালের কাণ্ড নয়, তুই-ই বল তো!

বেড়ালগুলোকে ঢুকতে দাও কেন?

ঢুকবে না কেন বাবা, কোন আগল দিয়ে আটকাব! এ যে খোলা ঘর।

বুড়ি নোংরাটা চেঁছে মাটির সরায় তুলল। কচুবনটা যে কত দূর বলে মনে হয়। খিল ধরা হাঁটু আর টলমলে মাথা নিয়ে অতদূর যাওয়া মানে যেন তেপান্তর পার হওয়া।

মেলা পাপ জমেছে বাবা। পাপের পাহাড়। সব ক্ষয় করে যেতে হবে তো...

উঠোন পেরিয়ে পুকুরের ধারে সেই কচুবন যেন এক অফুরান মরুভূমি। বয়সকালে বুড়ি এই উঠোনেই উদুখলে সর্ষে গুঁড়ো করত, ঢেঁকিঘরে পাড় দিত, পাঁজা পাঁজা বাসন মেজে নিয়ে আসত ঘাট থেকে। সেই শরীরই তো এইটে। সেই উঠোন। কিন্তু আজ আর বনিবনা নেই কারও। শরীরের সঙ্গে না, উঠোনের সঙ্গে না, কচুবনের সঙ্গে না।

ঢেঁকিঘর উঠে গেছে। উদুখল বিদেয় হয়েছে। ঘরবাড়িতে ধরেছে ক্ষয়। দুই বউয়ের তিন সংসার। তারা পালা করে পোষে। না পুষলে পাড়ায় নিন্দে হবে বলেই বোধহয় পোষে। নইলে গু-মুত, মরা ইঁদুর, আবর্জনার মতো তাকেও ফেলে দিত আস্তাকুঁড়ে।

বড় বউ মাঝে মাঝে মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বলে, এখন তো রস মজে বষ্টমি হয়েছেন, যখন বিয়ে হয়ে নতুন বউ এসেছিলুম তখন কম ঝাল ঝেড়েছেন? উঠতে খোঁটা, বসতে খোঁটা। আর কী মুখ বাবা, কী অন্তরটিপ্পনী। চোখের জলে বিছানা ভিজত আমার। সংসারে একতরফা কিছু হয় না, বুঝলেন! এখন দান উল্টে গেছে।

উঠোনটা পেরোতে পারল কী করে তা জামগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ভেবে পাচ্ছিল না বুড়ি। বুকটা এত ধড়াস ধড়াস কাঁপছে যে, এখনই না আবার মূর্ছা হয়। চোখে এই দিনের আলোতেও কেমন আঁধার ঘনিয়ে এল যে। কুঁজো হয়ে হাঁটার বড় কষ্ট। মাজার ব্যথায় কতকাল সোজা করতে পারেনি শরীরটাকে!

এমন হাঁফ ধরে গেছে যে জামতলার আগাছার মধ্যেই বুড়ি ধপ করে বসে পড়ে। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে চোখটা বোজে। হাতে মাটির চারায় নিঘিন্নে মল। তবে বুড়ি আর ঘেন্না পায় না। দিন রাত এসব নিয়ে মাখামাখি, ঘেন্না করবে কাকে?

আজকাল বেশিক্ষণ চোখ বুজে থাকলে একটা ভয় হয়, মরে গেলুম নাকি? ঘুমোনোর সময় মনে হয়, আর যদি না উঠি? মরার পর কেমন সব হবে তার চিন্তাও পেয়ে বসে বুড়িকে। যমদূতরা এসে তো

ধরবে সব গাজি গাজি করে। তারপর টানতে টানতে বৈতরণী পার করাবে। নিয়ে গিয়ে হাজির করবে যমরাজার সামনে। তখনই বুড়ি পড়বে বিপদে। কী জিজ্ঞেস করে না করে কে জানে বাবা। এ দিকে ছেলেরা যে শ্রাদ্ধশান্তিটাও ভাল করে করবে এমন ভরসা হয় না। শ্রাদ্ধশান্তি ঠিকমতো না হলে আত্মাটা বড্ড খাবি খাবে।

বুড়ি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছিল। খানিক অন্ধকার, খানিক আবছায়া, খানিক হিজিবিজি, ঝুলকালি, কী সব যেন চোখের সামনে। মাথায় আজকাল অবাক-অবাক সব চিন্তা আসে, ছবি আসে।

বুড়ি একটু বাদে চোখ খুলে চাইল। চোখের পাতাটা খুলতেও যেন কষ্ট, বাকি পথটা আর দাঁড়ানোর চেষ্টা করল না বুড়ি। হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে কচুবনের কাছে এসে নোংরাটা ফেলল।

কতকাল যে স্নান করে না খেয়াল নেই। আজকাল কেউ তো আর চান করিয়ে দেয় না। কুয়ো থেকে জল তুলে চান করবে তার সাধ্যি কী? সামনে পুকুরটা দেখে বড় লোভ হল, একটু ডুব দিয়ে নিলে হয় না?

কিন্তু পারবে কি? তালগাছের বাঁধানো ঘাটে, পা ঠিক রাখা মুশকিল। আর এ পুকুরের ধারেই ডুবজল। বুড়ি ভাবে, সাঁতার তো জানতুম, কিন্তু সে জানা কি আর কাজে দেবে? আজকাল বড় ভয় করে। সব কিছুকে বড় ভয় করে।

বুড়ি বসে আর একটু জিরোলো। গলাটা শুকিয়ে আছে তেষ্টায়। কিন্তু ফিরে তাকালেই আবার তেপান্তরের মাঠ মনে হয় উঠোনটাকে। কত দূরে সব সরে যাচ্ছে! ঘর, মানুষজন, ছেলেমেয়ে। বুড়ি চোখ বোজে। হাজারো স্বপ্নের বৃষ্টি মাথায় ঝরে পড়তে থাকে।

ও ঠাকমা, জঙ্গলে বসে কী করছ তখন থেকে? ও ঠাকমা...

এই একটা মাত্র নাতনি নাচুনিই তার যা একটু খোঁজখবর নেয়। কাছে বেশি আসে না, এলে মা বকবে। তবু একটু টান আছে, একটু মায়া।

বুড়ি কথা বলতে গিয়ে দেখল, গলায় কেন যেন স্বর নেই। কিছুতেই একটাও কথা গলায় তুলে আনতে পারল না বুড়ি।

ও ঠাকমা, অমন করছ কেন? ঘরে যাও।

বুড়ি চোখ বুজে ভাবল, মরে গেছি নাকি? ছেলেরা ঠিকমতো শ্রাদ্ধটা করবে তো! শ্রাদ্ধ করে বড় ছেলে। তা বুড়ির বড় ছেলে হল বিষ্টু। তাকে কি খবরটা ঠিকমতো দেবে এরা? মুখাগ্নি তো সে আর পেরে উঠবে না। অতটা রাস্তা, খবর পেয়ে আসতে আসতে মড়া বাসি হবে। নাঃ, বাঁচাটা যেমন ভাল ছিল না, মরাটাও তেমন ভাল হল না বুড়ির।

ও ঠাকমা?

কাকে ডাকছে ছুঁড়িটা? মরে পড়ে আছি এখানে, দেখতে পায় না নাকি? কানে ঝিঁঝি ডাকছে। হাত পা সব ঠাণ্ডা মেরে গেছে। বুকখানা যেন পাথর। আর মাথাটা অন্ধকার।

ও ঠাকমা! ঠাকমা গো! ওঠো না! বলে গায়ে ধাক্কা দেয় নাচুনি।

বুড়ি দেখল, না, এখনও মরেনি সে। ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, একখানা কাঁকলাস হাত বাড়িয়ে মাটিতে ভর রাখল।

একটা শ্বাসও পড়ল ফোঁস করে।

ও ঠাকমা! তোমার কী হয়েছে?

বুড়ি নাতনির দিকে চেয়ে মুখখানা মায়া ভরে দেখল। কত কাছে, কিন্তু কত দূর! বলল, একটু ধন্দ লেগেছিল রে। এখন ঠিক আছি।

ধরে তুলব তোমায়?

ঘেন্না পাবি না তো!

বাঃ, তোমাকে আবার ঘেন্না কীসের? মা বকবে বলে, নইলে তোমার ঘর তো রোজ আমিই পরিষ্কার করতে পারি।

অত জুড়িয়ে-দেওয়া কথা বলিসনি রে, ওতে মায়া বাড়ে।

এখন আমাকে শক্ত করে ধরো তো! তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

নাচুনি ধরে ধরে ঘর অবধি নিয়ে এল। একটা ভেজা ন্যাতা এনে দিল ছুটে গিয়ে, ও ঠাকমা, গুয়ের জায়গাটা লেপে দাও। নইলে বকুনি খাবে।

দিই। বলে বুড়ি উবু হয়ে বসল। মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে। মুখাগ্নি কে করবে, শ্রাদ্ধটা হবে কি না, এ সব ভেবে বড্ড উচাটন লাগছে। বিষ্টু যদি সময়মতো খবর না পায়, তা হলে কী হবে? এদের মোটে গা নেই যে!

উঠোনের রোদে বাচ্চারা খেলছে। তারই মধ্যে কে একজন চটি ফটফটিয়ে উঠে এল দাওয়ায়। বুড়ির মেজো ছেলে কৃষ্ণপদ।

আজও ঘরে হেগে ফেলেছ শুনলাম।

বুড়ি সভয়ে চেয়ে থাকে ছেলের দিকে। এদের মুখচোখের চেহারা মোটেই ভাল নয়। কেমন যেন রাগ-রাগ ভাব। কখন যে বকাঝকা করবে তার কোনও ঠিক নেই।

না বাবা, সে একটা বেড়ালের কাণ্ড।

কৃষ্ণপদ মহা বিরক্ত গলায় বলে, এ বাড়িতে বাস করাই যে কঠিন করে তুললে। এরকম হলে তো মুশকিল দেখছি।

বুড়ির বুক গুড়গুড় করতে থাকে। কী বলবে তা ভেবে পায় না। কথার বড় ফের থাকে। কখন কোন কথাটায় লোকে দোষ ধরে তার কিছু ঠিক নেই।

এরকম চললে আর দাওয়ার কিন্তু জায়গা হবে না। গোয়ালঘরটা খালি পড়ে থাকে, ওটায় গোবর দিয়ে দেখ'খন। ওটাতেই থেকো গিয়ে।

বুড়ি তেমনি চেয়ে থাকে। গোয়াল আর এর চেয়ে কি খারাপ হবে? বুড়ি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

কৃষ্ণপদ ঘরে গেল। বুড়ি বিছানায় উঠে একখানা কাঁথা টেনে গায়ে দিয়ে বসল। কখন শীত করে, কখন হাঁসফাঁস করে ভেতরটা তার কিছু ঠিক নেই। আজ কী দিয়ে ভাত দেবে এরা? মুখে বড্ড অরুচি কিন্তু পেটে খিদে থাকে। একটু লেবু হলে দুটি খাওয়া যেত।

বেড়ালটা ঘরে এসে একখানা ডন দিয়ে লাফিয়ে বিছানায় উঠল। রোজই ওঠে। তাড়ালেও যায় না। তা ওঠে উঠুক। একটা প্রাণ তো। কাছাকাছি আর একখানা বুকও ধুকধুক করছে জানলে কেমন যেন একটু ভরসা হয়।

বেড়ালটার দিকে চেয়ে বুড়ি বলে, আজ বড় জ্বালিয়েছিস মুখপুড়ি।

বেড়ালটা চোখ মিটমিট করে ফের কাঁথাখানির মধ্যে আরামে পুঁটুলি পাকিয়ে চোখ বুঝল। বড্ড মায়া।

নাতজামাই পাঁচটা টাকা প্রতিবারই হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। বুড়ি সেই টাকাটা পরে আর খুঁজে পায় না কিছুতেই। বালিশের তলায় না, তোশকের তলায় না, চাদরের তলায় না, আঁচলে বাঁধা না। কাউকে জিজ্ঞেস করা মহাপাপ। জিজ্ঞেস করলেই বলবে, চুরি করেছি নাকি?

পরশু না কবে যেন এসেছিল নাতজামাই। টাকাটা সেই থেকে খুঁজছে বুড়ি। পাচ্ছে না। পাবে না, জানা কথা। টাকা দিয়ে কিছু করেও উঠতে পারবে না সে। তবে ঘাটখরচার অভাবে গরিবগুরবোরা যেমন মড়া না পুড়িয়ে মুখাগ্নি করে জলে ফেলে দেয় তার বেলাতেও যেন ছেলেরা অমনিধারা না করে তার জন্যই কেষ্ট আর হরির হাতে টাকাগুলো দেওয়ার ইচ্ছে ছিল বুড়ির। হল না। ঘাটখরচাটা পেলে আর মড়া নিয়ে হেলাফেলা করত না।

দুপুরবেলা বুড়ি ঘুমোচ্ছিল, নাচুনি এসে চাপা গলায় ডাকল, ঠাকমা! ও ঠাকমা।

কে রে!

তোমাকে গোয়ালঘরে পার করবে বলে গোয়াল পরিষ্কার হচ্ছে যে। রাখাল ছেলেটা ঝাঁটপাট দিচ্ছে।

বুড়ি নাতনির দিকে চায়, তোর কি তাতে কষ্ট হবে রে ভাই।

গোয়ালে তুমি একা থাকতে পারবে? ভয় করবে না?

যেখানে ফেলে রাখবে সেখানেই পড়ে থাকব মা। আর ক'দিনই বা। কিন্তু তোর কি মনে কষ্ট হবে

তাতে? বল না।

কষ্ট হবে না? গোয়ালঘর সেই কত দূরে! রান্নাঘরের পিছনে। ওখানে আমগাছটায় ভূত থাকে যে।

কত ভূত এ বাড়িতে। আমি রোজ দেখি।

বল কী গো!

ওই লেবুতলায়। রোজ নিশুতরাতে ভূত আসে। তোর দাদু, জ্যাঠাদাদু, আরও কত।

ওম্মা গো!

ভয় পাসনি। ভয়ের কী? যখন বুড়ো হবি তখন দেখবি, তুই ভূতের দলেরই হয়ে গেছিস।

গোয়ালঘরে কিন্তু কাঁকড়াবিছে আছে। আর মশা।

সে জানি। আমাকে কম হুল দিয়েছে বিছে? তখন একটা গোরু ছিল, রোজ পরিষ্কার করতে যেতুম তো।

বড় কাকার সঙ্গে বাবার খুব ঝগড়া হল দুপুরের খাওয়ার সময়। বাবা গোয়ালঘরের টিন আর খুঁটি বিক্রি করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল, তুমি থাকলে তো আর তা হবে না। তাই রেগে গেছে।

তাই বুঝি? কোন ভাবে যে রাখবে আমাকে তার ঠিক পাচ্ছে না। এ বাড়ি আমার শ্বশুরদের তিন চার পুরুষের ভিটে ছিল। এখনও নিশুত রাতে তারাই আসে। দেখে যায় আমার কেমন হেনস্থা হচ্ছে।

তোমার কান্না পাচ্ছে না ঠাকমা?

কান্না? না, আজকাল আর কেন কান্না আসে না বল তো! চোখে এক ফোঁটা জল নেই। শুধু কেবল সারাদিন ভয়-ভয় করে। কেবল ভয়। আগে তো কত কাঁদতুম! চোখে কত জল ছিল তখন। আজকাল পোড়া চোখে জলও নেই।

নাচুনি চলে যাওয়ার পর বুড়ি ভাবতে বসল, গোয়ালঘর কি এর চেয়ে কিছু খারাপ হবে? না বাবা, গোয়ালঘরই তো ভাল মনে হচ্ছে। অন্তত একটু চোখের আড়াল হয়ে তো থাকতে পারবে। বেড়াগুলো এতদিনে আর বুঝি আস্ত নেই। চালের টিনেও ফুটো ছিল। তা হোক বাবা, বাক্যের বিষ যদি তাতে কিছু কমে।

গোয়ালের কথা ভাবতে ভাবতেই বেলাটা গেল আজ।

নিশুত রাতে রোজই ঘুম ভাঙে। আজও বুড়ি উঠে বসল। মেটে হাঁড়িতে পেচ্ছাপ করতে বসে খোলা জায়গাটা দিয়ে চোখ গেল, লেবুতলাটার দিকে। বুকটা কেঁপে উঠল হঠাৎ। ভুল দেখছে নাকি? লেবুতলা থেকে একটা ছায়ামূর্তি যে উঠে এল বারান্দায়! এদিকেই আসছে।

বুড়ি বুঝল এবার ডাক এসে গেছে। ওই নিতে এসে গেছে তাকে।

বুড়ি কাঁপা গলায় বলে উঠল, খাবি বাবা যমদূত? খাবি আমায়? দাঁড়া বাবা, এরা সব কী করতে কী করবে তার ঠিক নেই। ও হরি, ও কেষ্ট, তোরা একটু বিষ্টুকে খবর পাঠাবি তো! মুখাগ্নি না হলে যে আত্মা বড় কষ্ট পায়। শ্রাদ্ধও তো সে ছাড়া কেউ করতে পারবে না। বলি ও হরি...

মা!

এ ডাক গত একশো বছরেও যেন শুনতে পায়নি বুড়ি। খানিক হাঁ করে থেকে বলে, ভুল হয়নি তো বাবা! মা বলে ডাকছ!

মা! আমি বিষ্টু।

আবার বোধহয় স্বপ্নই দেখছে। আজকাল হিজিবিজি কত কী দেখে।

কে বললি? সত্যিই বিষ্টু তো!

হ্যাঁ মা।

তোকে ওরা খবর পাঠিয়েছে নাকি? আমি তবে কখন মরলুম বল তো! অনেকক্ষণ মরেছি নাকি? মড়া বাসি হয়নি তো!

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, তুমি মরোনি মা। বুড়ো বয়সে ওরকম ভীমরতি হয়।

একটা টর্চের ফোকাস মেরে চারদিকটা দেখে বিষ্ণুপদ বলল, তা হলে এইখানেই থাকতে হচ্ছে আজকাল!

বুড়ি একটু ধাতস্থ হল এইবার। কাঁপা গলায় বলে, ও বিষ্টু, হঠাৎ এই মাঝরাতে এলি কেন বাবা!

খারাপ খবর নেই তো।

না মা। বাসেই তো উঠলুম বিকেলের পর। নাটাগড়ে বাস বদলাতে হল। তার ওপর আবার সেই বাসের চাকা খারাপ হল মাঝরাস্তায়। এই এসে নামলুম।

ও বিষ্টু, কোথায় বসাব তোকে বাবা। এ সব হাগামোতা বিছানা, এখানে তো বসতে পারবি না বাবা। ওদের সব ডেকে তুলি?

না মা। তোমাকে তো ঘরের বার করেছে দেখছি। আমার সঙ্গেই কি আর ভাল ব্যবহার করবে? ওদের কাছে তো আসা নয়, তোমার কাছেই আসা। বিছানাতেই বেশ বসতে পারব।

প্রবৃত্তি হলে তাই বোস বাবা। বুড়ো বয়সে আর কিছু ধরে রাখতে পারি না। বাহ্যে-পেচ্ছাপ হয়ে যায় আপনা থেকেই। কত কথা শুনতে হয় সে জন্য। তা এবার ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। গোয়ালঘরে গিয়ে শান্তিতে থাকব।

এরপর গোয়ালঘরও আছে মা! তোমার ভোগান্তি দেখছি শেষ হয়নি!

টর্চখানা তোর মুখের দিকে একটু তুলে ধর তো! দেখি মুখখানা! কতকাল দেখিনি, ভাল করে মনেও পড়ে না।

এ মুখ কি দেখাতে আছে মা! কত পাপ করেছি।

খুব বুনো হয়ে গেছিস না কি বাবা? কী সুন্দর রাজপুত্তুরের মতো চেহারা ছিল তোর।

ও কথা আর বোলো না মা। শুনলে গা যেন রী-রী করে। শুনলুম, গোবিন্দ তোমার কাছে খুব আসেটাসে।

খুব আসে। সোনার চাঁদ ছেলে। বুক ভরা মায়াদয়া।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, হ্যাঁ মা, খুব ভাল।

বুড়ির একখানা কঙ্কালসার হাত বিষ্ণুপদর পিঠে মাকড়সার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিষ্ণুপদ দু হাতে মুখখানা ঢাকে।

ও বিষ্টু, কথা কইছিস না যে! আমার যে কথা শুনতে বড় ভাল লাগে। নিঃসাড়ে পড়ে থেকে কতবার মনে হয়, মরে গেছি বুঝি!

তোমার কাছটিতে যদি বাকি জীবনটা থাকি মা, তা হলে কেমন হয়?

বিশ্বাস হওয়ার মতো কথাই নয়। বুড়ি থরথর করে কেঁপে উঠে বলে, মানিক আমার! সোনা আমার! ভোলাচ্ছিস বুঝি! নইলে ঠিক আমি স্বপ্নই দেখছি।

বিষ্ণুপদ ফিসফিস করে বলে, বড় ইচ্ছে করে মা।

যখন ছোটটি ছিলি, যখন শুধু মায়ের ধন ছিলি, তখন মায়ের বুকেই জায়গা হয়ে যেত। এখন তো কত কী হয়েছিস বাছা। বউয়ের স্বামী, ছেলেপুলের বাবা, জামাইয়ের শ্বশুর। কেমনধারা সব হয়ে যায় বল তো!

বিষ্ণুপদ টর্চ জ্বেলে জ্বেলে ঘরখানা দেখে। কুসুমপুরে তার পাকা ঘরবাড়ি, খেতখামার, টাকা পয়সা। টর্চের আলোয় সে তার সব ঐশ্বর্যের অর্থহীনতা দেখতে পায় যে, একটা কুকুর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল। এদিকটায় বেড়া নেই, দরজার ঝাঁপ নেই। বিষ্ণুপদ টর্চটা নিবিয়ে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মা, তুমি শুয়ে পড়ো। আমি কাছটিতে বসে থাকি।

ঘুম কি আসে বাবা! কতবার ঘুম ভেঙে উঠে উঠে দেখি। ওই লেবুঝোপের দিকটায় নিশুতরাতে তোর বাবা আসে, জ্যাঠা আসে, আরও কারা সব আসে যেন। ও বিষ্টু, একটু মা বলে ডাক তো!

মা! মাগো! এবার শুয়ে একটু ঘুমোও।

তুই কী করবি? কিছু খাসনি তো! খিদে পায়নি?

না মা। বাস থেকে নেমে হোটেলে খেয়ে নিয়েছি নাটাগড়ে।

তুমি এবার ঘুমোও।

পালাবি না তো ঘুমোলে? ও বিষ্টু!

পালাব না।

আজ বড় ঘুম জড়িয়ে আসে কেন চোখে? বুড়ি ভাল করে বালিশে মাথা না রাখতেই রাজ্যের ঘুম নেমে আসে চোখে। শরীরটা মুড়ে একটুখানি হয়ে বুড়ি আজ ঘুমোয়। বুকটা ঠাণ্ডা লাগে বড়। বিষ্টু এসে গেছে। বুড়ির তবে মুখাগ্নি হবে, শ্রাদ্ধ হবে। যমরাজের কাছে গিয়ে আর হেনস্থা হতে হবে না।

বিষ্ণুপদ টর্চ জ্বেলে দেখতে পেল, তার মায়ের মুখে ব্যথা বেদনার অনেক আঁকিবুকি, গভীর সব রেখা। তবু ঠোঁটে একখানা কী সুন্দর ফোকলা হাসি ফুটে আছে।